বিশেষ সংখ্যা

Rvbœvwi 2023 ▪ †cŠl-gvN 1429

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

RwZi D‡Ï‡k cavbgš¿x fvlY
e½eÜz ¯‡`k cZ¨veZb w`em
mvd‡j¨i AMhvÎvq Avi I GKwU eQi

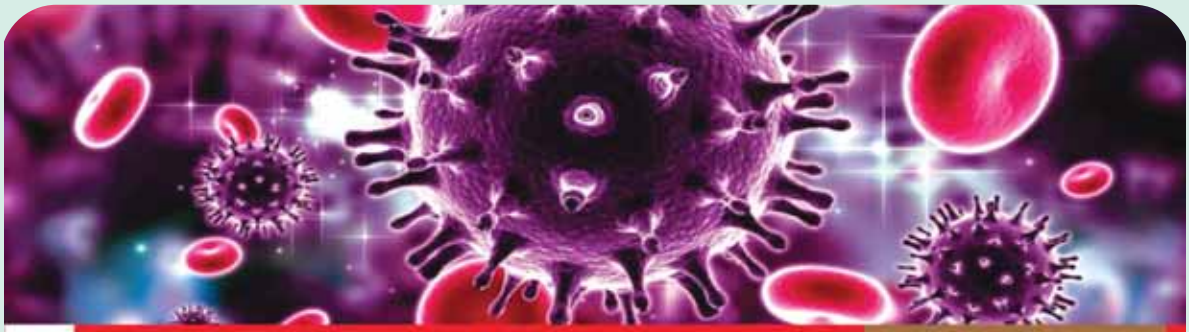

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- nVvr Ri, Kwk ev Mjve¨v_v Ae¯vq Amy‡eva Ki‡j ¯vbxq wmwfj mvRb, Dc‡Rjv ¯v¯¨ KgKZvi m‡½ †hvMv‡hvM Ki‡b|

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

Pjw”PÎ I cKvkbv Awa`ßi, Z_¨ I m¤úPvi gšYvjq

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জানুয়ারি ২০২৩ ⌟ পৌষ–মাঘ ১৪২৯

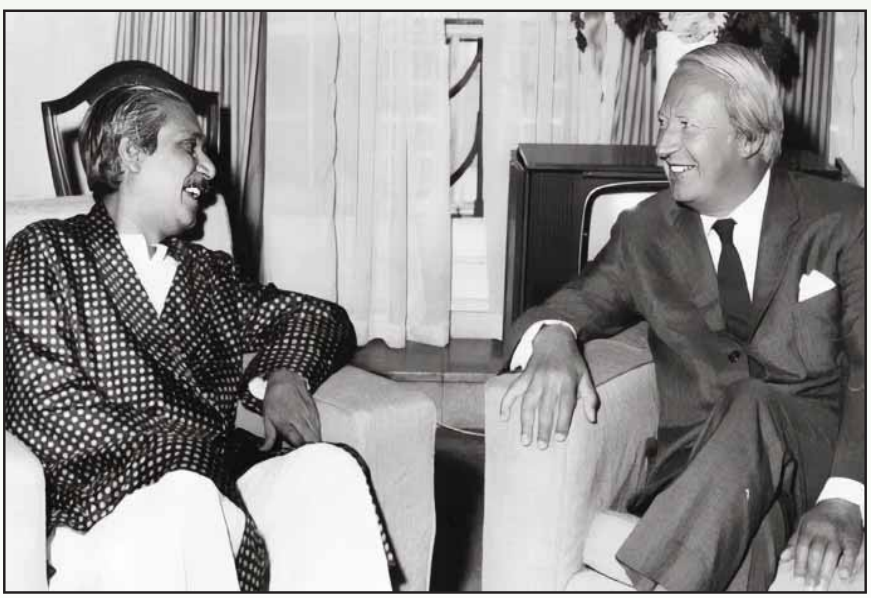

৯ই জানুয়ারি ১৯৭২ লন্ডনে বঙ্গবন্ধু ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের বৈঠক

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির জীবনে ১০ই জানুয়ারি একটি স্মরণীয় অনন্য দিন। ১৯৭২ সালের এদিনে জাতির পিতা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলাদেশের মানুষ বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করে। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৫১ বছর পূর্ণ হলো ১০ই জানুয়ারি ২০২৩। *সচিত্র বাংলাদেশের* এ সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জানুয়ারি ২০২৩ সরকারের মেয়াদের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে সরকারের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক উঠে আসে। বর্তমান সরকার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে নিরলসভাবে। আশা করা যায়, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশগুলোর সাথে সমান তাল মিলিয়ে চলতে পারব। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভাষণ এ সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র রয়েছে এ সংখ্যায়।

আমরা বাংলাদেশে মেট্রোরেল চালুর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছি। ঢাকার যানজট নিরসন এবং পরিবেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বিদ্যুৎচালিত মেট্রোরেল। দ্রুতগামী, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, সময়সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা মেট্রোরেল নিয়ে নিবন্ধ ও কবিতা রয়েছে।

এছাড়া গল্প, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত আয়োজন নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যাটি। আশা করছি, জানুয়ারি সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ৮
আমির হোসেন আমু

নতুন বছর: চ্যালেঞ্জও নতুন ১০
মোনায়েম সরকার

দশই জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

সমন্বিত উন্নয়নের বাংলাদেশ ১৭
প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

অহিংস ভাবনা: গান্ধী থেকে বঙ্গবন্ধু ২১
রফিক জামান

বাংলাদেশের অর্থনীতি ২৩
এম এ খালেক

মহানায়কের প্রত্যাবর্তন ও তিনটি গান ২৭
অনুপম হায়াৎ

শেখ মুজিব: শেখ বংশের আলোকবর্তিকা ২৯
প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

স্বপ্ন নয়, মেট্রোরেল এখন বাস্তব ৩১
সেলিনা আক্তার

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: স্মরণীয় সেই দিন ৩৩
মোতাহার হোসেন

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় পুরাণের ব্যবহার ৩৫
পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

শেখ লুৎফর রহমানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পত্র যোগাযোগ ৩৯
ইমরুল ইউসুফ

ডায়াবেটিস এক নীরব ঘাতক ৪২
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

mwWKb Uz½xcvov: বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি ৪৪
ইমরুল কায়েস

সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনে অনিবার্য নাম মুহম্মদ খসরু ৪৭
অনিকেত শামীম

তথ্য সুরক্ষায় সরকারের কার্যক্রম ৫০
সুস্মিতা চৌধুরী

বিশ্ব যুদ্ধজনিত অনাথ শিশু দিবস ৫১
ফাতেমা আক্তার

সমন্বিত সামাজিক সেবা ও উন্নয়নে সরকার ৫২
অনিল কুমার

গল্প

মিশন বাংলাদেশ ৫৪
সিরাজউদ্দিন আহমেদ

মনের অজান্তে ৫৯
নাসিম সুলতানা

কবিতাগুচ্ছ ৬২-৬৬

গোলাম নবী পান্না, ইউসুফ রেজা, আ. শ. ম. বাবর আলী, মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান সাঈদ তপু, গোবিন্দলাল সরকার, তুষার আলমগীর শেলী সেলিনা, মো. আব্দুল হাই, নজরুল হায়াত কাব্য কবির, রুস্তম আলী, আবু জাফর আবদুল্লাহ্ আবুল কালাম আজাদ, আতিক রহমান, পারভীন আকতার, মুহাম্মদ ইসমাঈল, মোহাম্মদ ইল্ইয়াছ ফায়েজা খানম

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৭
প্রধানমন্ত্রী ৬৮
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৬৯
শিক্ষা ৭১
উন্নয়ন ৭২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৭৩
অর্থনীতি ৭৩
নারী ৭৪
সামাজিক নিরাপত্তা ৭৫
কৃষি ৭৫
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৬
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৭৬
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৭৭
ক্রীড়া ৭৮

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
চলে গেলেন বীর উত্তম শামসুল আলম ৭৯

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২ রাজধানীর উত্তরায় 'মেট্রোরেল লাইন-৬ ও বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল'-এর উদ্‌বোধন ফলকের প্রতিরূপ উন্মোচন করেন। এসময় জাতির পিতার কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি সরকার গঠন করে। বর্তমান সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জানুয়ারি ২০২৩ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে তাঁর সরকারের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ এদেশের মহৎ ও বৃহৎ অর্জনসমূহ আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের হাত ধরেই অর্জিত হয়েছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি দেখুন, পৃষ্ঠা–৪

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসাধারণ বিক্রমে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বিজয় অর্জনের আনন্দের মধ্যেও উৎকণ্ঠা, শূন্যতা ও অপূর্ণতা ছিল। পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান থেকে মুক্তি পেয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিনই বাংলাদেশের বিজয় পরিপূর্ণতা পায়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস নিয়ে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস', 'দশই জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস', 'মহানায়কের প্রত্যাবর্তন ও তিনটি গান' ও 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: স্মরণীয় সেই দিন' শীর্ষক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–৮, ১৪, ২৭ ও ৩৩

সাফল্যের অগ্রযাত্রায় আরও একটি বছর

বাংলাদেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতুতে চলছে যানবাহন। যাত্রী নিয়ে ছুটছে ঢাকার মেট্রোরেল। এসবই এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তব। যোগাযোগ ব্যবস্থার দুটি মাইলফলক। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেলসহ বড়ো বড়ো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতীয় আয়, প্রবৃদ্ধি, গড় আয়ু, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সাফল্যের অগ্রযাত্রায় আরও এক বছর নিয়ে দেখুন 'নতুন বছর: চ্যালেঞ্জও নতুন', 'সমন্বিত উন্নয়নের বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশের অর্থনীতি' ও 'স্বপ্ন নয়, মেট্রোরেল এখন বাস্তব' শীর্ষক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–১০, ১৭, ২৩ ও ৩১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জানুয়ারি ২০২৩ আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদের চার বছরপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

ঢাকা, ৬ই জানুয়ারি ২০২৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের চার বছরপূর্তি উপলক্ষে আমি দেশবাসী এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত প্রবাসী ভাইবোনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। একইসঙ্গে আপনাদের খ্রিষ্টীয় নতুন বছর ২০২৩-এর শুভেচ্ছা জানাই।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমি সালাম জানাই।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল এবং ১০ বছরের শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, মুক্তিযোদ্ধা যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ব্রিগেডিয়ার জামিল উদ্দিন আহমেদ এবং পুলিশের এএসআই সিদ্দিকুর রহমানসহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

স্মরণ করছি ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহত আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভী রহমানসহ ২২ নেতাকর্মীকে। স্মরণ করছি ২০০১ সালের পর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ.এম.এস কিবরিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার, মঞ্জুরুল ইমাম, মমতাজ উদ্দিনসহ ২১ হাজার নেতাকর্মীকে।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামাত জোটের অগ্নি সন্ত্রাস এবং পেট্রোল বোমা হামলায় যারা নিহত হয়েছেন আমি তাঁদের স্মরণ করছি। আহত ও স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর যেসব রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মারা গেছেন, আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত এবং শান্তি কামনা করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

২০০৯ সাল থেকে একটানা ১৪ বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এই ১৪ বছরে আমরা দেশ এবং দেশের জনগণকে কী দিতে পেরেছি– তার বিচার-বিশ্লেষণ আপনারা করবেন। বর্ষপূর্তিতে আমি শুধু কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করে আপনাদের স্মৃতিকে নাড়া দিতে চাই।

২০০৯ সালে আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখনও বিশ্বব্যাপী মন্দাবস্থা চলছিল। চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ছিল আকাশচুম্বী। অন্যদিকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছিল নিম্নমুখী। বিদ্যুতের অভাবে দিনের পর দিন লোডশেডিং চলত। গ্যাসের অভাবে শিল্পকারখানার মালিকেরা যেমন হাহাকার করত, তেমনি চুলা জ্বলত না মানুষের বাড়িতে। সারসহ কৃষি উপকরণের উচ্চমূল্য এবং জ্বালানি তেলের অভাবে কৃষকের নাভিশ্বাস উঠেছিল।

এমনি এক অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই। নির্বাচনি ইশতাহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন করি এবং জনগণের সামনে তুলে ধরি।

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠনের পর সেই ইশতাহারের আলোকে আমরা আশু করণীয়, স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

স্থবির অর্থনীতিকে সচল করতে শুরুতেই কৃষি, জ্বালানি, বিদ্যুৎসহ কয়েকটি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা কাজ শুরু করি।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বেশ কয়েকটি ছোটো-বড়ো বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করি।

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই রাসায়নিক সারের দাম কমিয়ে দেই। এরপর আরও দু'দফায় সারের দাম হ্রাস করে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় আনা হয়। এমনিভাবে প্রতিটি খাতে আমরা পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেই।

রূপকল্প-২০২১-এর পর আমরা রূপকল্প-২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছি। রূপকল্প-২০২১-এ আমরা অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলাম। আজকে সন্তুষ্টচিত্তে বলতে পারি, আমরা সে প্রতিশ্রুতি পূরণে সক্ষম হয়েছি।

রূপকল্প-২০৪১ লক্ষ্য হচ্ছে-২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করা। বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-এর লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে একটি টেকসই উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে টিকিয়ে রাখা।

আমাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার সুফল জনগণ আজ পেতে শুরু করেছে। আজ দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুতের আওতায়। নিজস্ব গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন করে এলএনজি আমদানির ব্যবস্থা নিয়েছি। প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত আজ মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে গ্যাসের চুলায় রান্না হয়।

আমরা নানা প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করেছি। এই সেতু দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলাকে সড়ক পথে ঢাকা এবং অন্যান্য জেলার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করেছে। গত ২৮শে ডিসেম্বর মেট্রোরেল উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে আমরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছি। কিছুদিনের মধ্যেই শুধু বাংলাদেশেই নয়, চট্টগ্রামে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পাতাল সড়কপথ– বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্‌বোধনের মাধ্যমে আরেকটি মাইলফলক স্থাপিত হবে। পাবনার ঈশ্বরদীর রূপপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আমরা ২০১৮ সালের মে মাসে মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ করেছি।

প্রিয় দেশবাসী,

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাসহ এ দেশের মহৎ এবং বৃহৎ অর্জনসমূহ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের হাত ধরেই অর্জিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করি মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর দ্বারপ্রান্তে, তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি তাঁকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ হত্যা করে। স্তব্ধ হয় বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা।

২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার সুযোগ পায়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১–এই ৫ বছরে দেশের প্রতিটি খাতে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়। বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেই। দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পাহাড়ে শান্তি স্থাপন করি। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ইউনেসকো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পায়। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার শুরু করি।

কিন্তু ২০০১ সালের প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে জামাত-বিএনপি জোট আবার ক্ষমতায় আসে। বিএনপি-জামাতে সরকারের ঐ ৫ বছর ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। হত্যা-গুম, ধর্ষণ, লুটপাট, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো এবং জঙ্গিবাদের লালন-পালনসহ অপশাসন-কুশাসনে জোট সরকার যে মাইলফলক স্থাপন করেছিল, এদেশের মানুষ আগে কখনও তা দেখেনি। শুধু আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয় ঐ সময়। অর্থনীতির চাকা স্থবির হয়ে পড়ে। মূল্যস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস, সাক্ষরতা হ্রাস জনজীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

মেয়াদ শেষে নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে স্বাভাবিক ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ভোটার তালিকায় ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচনি বৈতরণী পার হওয়ার ষড়যন্ত্র করে। দলীয় রাষ্ট্রপতিকেই প্রধান উপদেষ্টার পদ দিয়ে সরকার গঠন করে ৬ই জানুয়ারি নির্বাচনের নামে প্রহসনের উদ্যোগ নেয়। জনগণ তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

এমনি এক অরাজক পরিস্থিতির মুখে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। তারাও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে শুধু ব্যর্থই হয়নি, নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কালিমালিপ্ত করে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই সরকার ছবিসহ একটি সুষ্ঠু ভোটার তালিকা তৈরি এবং স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সসহ নির্বাচনি সংস্কার সম্পন্ন করে। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

প্রিয় দেশবাসী,

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা একটানা ১৪ বছর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছি। ১৬ বছর আগে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের শেষ অর্থবছরে আমরা কোথায় ছিলাম আর এখন আমাদের অবস্থান কোথায় কয়েকটি আর্থসামাজিক সূচকের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তা তুলে ধরতে চাই।

জোট সরকারের শেষ অর্থবছর ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলারে।

২০০৫-২০০৬ সময়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ। বর্তমানে দারিদ্রের হার ২০ শতাংশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫ দশমিক চার-শূন্য শতাংশ। করোনা মহামারির আগে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৮ দশমিক এক-পাঁচ শতাংশে। ২০০৫-২০০৬-এ জিডিপির আকার ছিল মাত্র ৬০ বিলিয়ন ডলার। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জিডিপি'র আকার ৪৬০ দশমিক সাত-পাঁচ বিলিয়ন ডলার।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার

৫৭ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেটের আকার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা।

বিএনপি-জামাতের শেষ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি খাতে আয় হয়েছিল ১০ দশমিক পাঁচ-দুই বিলিয়ন ডলার। ২০২১-২০২২ অর্থবছর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ দশমিক শূন্য-আট বিলিয়ন ডলারে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ৪ দশমিক আট-শূন্য বিলিয়ন ডলার।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিদেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা পাঠিয়েছেন ২২ দশমিক শূন্য-সাত বিলিয়ন ডলার। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তা ৪৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও মূল্যস্ফীতির কারণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪ বিলিয়ন ডলারে, যা ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য রিজার্ভ রয়েছে।

২০০৫-২০০৬ সময়ে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৪৫ জন। বর্তমানে তা নেমে এসেছে ২২ জনে। গড় আয়ু সাড়ে ৬৪ বছর থেকে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার হার ৪৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫ দশমিক ২ শতাংশ হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৭১ শতাংশ, তা হয়েছে ৯৯ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৩৭৩ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে কৃষি খাতে ভরতুকি দেওয়া হয় ৫৯২ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর কৃষি খাতে মোট ভরতুকির পরিমাণ ৪০ হাজার কোটি টাকা। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ৭৯ লাখ মেট্রিক টন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে চাল, গম, ভুট্টা ৪ কোটি ৭২ লাখ ৮৮ হাজার মেট্রিক টন।

বিএনপি-জামাত জোটের শেষ বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছিল মাত্র ৩ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৫ হাজার ৮২৬ মেগাওয়াট। সে সময় বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ছিল মাত্র ৪৫ শতাংশ। ২০২২ সালে শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা দিয়েছি। সব ঘর আলোকিত করেছি।

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ৪১তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। জেন্ডার সমতা এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে।

প্রিয় দেশবাসী,

গত ১৪ বছরে যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক ও রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রধান প্রধান নদীগুলোর উপর সেতু নির্মাণ। বিগত ১৪ বছরে আমরা পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু, তিস্তা সেতু, পায়রা সেতু, ২য় কাঁচপুর সেতু, ২য় মেঘনা, ২য় গোমতী সেতুসহ শত শত সেতু, সড়ক, মহাসড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ করেছি।

এছাড়া ঢাকায় হানিফ ফ্লাইওভার, তেজগাঁও-মগবাজার-মালিবাগ ফ্লাইওয়ার, কমলাপুর-শাহজাহানপুর ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামে আক্তারুজ্জামান চৌধুরী ফ্লাইওভার ও বন্দারহাট ফ্লাইওভারসহ বহুসংখ্যক ছোটোবড়ো ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে।

আমরাই প্রথম ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা, ঢাকা-এলেঙ্গা মহাসড়ক চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করি। ঢাকা-মাওয়া-জাজিরা এক্সপ্রেসওয়ে দেশের প্রথম এ ধরনের মহাসড়ক। এলেঙ্গা-রংপুর মহাসড়ক, আরিচা মহাসড়ক এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এয়ারপোর্ট থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আগামী বছর যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে খুলনা পর্যন্ত এবং চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপনের কাজ চলছে। যমুনা নদীর উপর রেলসেতু নির্মাণকাজও এগিয়ে যাচ্ছে। গত নভেম্বরে একদিনে ১০০ সেতু এবং ডিসেম্বরে ১০০ সড়ক উদ্‌বোধন করা হয়। দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে এ এক অনন্য অর্জন।

২০০৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৭১৮ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ১ লাখ ১৩ হাজার ৩০৩ মিটার সেতু নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, ২১ হাজার ২৬৭ মিটার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম। বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য়, স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে ২য়। প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ১ কোটি কৃষক ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। ভরতুকির টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমা হয়। সেচের জন্য সুলভমূল্যে বিদ্যুৎ এবং কৃষিযন্ত্র ক্রয়ে ৭০ শতাংশ ভরতুকি পাচ্ছেন।

১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই অনেকগুলো অঞ্চলে দেশি-বিদেশি কোম্পানি বিনিয়োগ শুরু করেছে। কৃষি পণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কৃষি উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন ও ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'আমার গ্রাম–আমার শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে শহরের সকল নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। গ্রামেও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে গেছে। এ পর্যন্ত ৩৫ লাখেরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে জমিসহ ঘর প্রদান করা হয়েছে। ২ কোটি ৫৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি-উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী,

২০২০ সালের শুরুতে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারি ছড়িয়ে পড়ার পর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল। কিন্তু আপনাদের সহায়তায় এবং আমাদের সরকারের সময়মতো উদ্যোগ গ্রহণের ফলে আমরা খুব ভালোভাবেই সেই মহামারি মোকাবিলা করতে পেরেছি। টিকা পাওয়ার যোগ্য শতভাগ মানুষকে বিনামূল্যে টিকা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থনীতিতে মহামারির প্রভাব মোকাবিলায় ২৮টি প্যাকেজের

আওতায় ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছি। গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্পকারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ৫০ লাখ প্রান্তিক মানুষকে দুই দফায় আড়াই হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারির সময় প্রায় ৭ কোটি ৩০ লাখ ৫০ হাজার মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে প্রায় ২ লাখ ১৩ হাজার ৪৬৭টি।

তবে করোনাভাইরাস মহামারির ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে না উঠতেই শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। পশ্চিমা দেশগুলোর এবং রাশিয়ার পালটাপালটি অবরোধের ফলে খাদ্য, জ্বালানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে পরিবহণ খরচ। ফলে আমাদের দেশেও জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। আমরা কয়েকটি পণ্য বেশি দামে কিনে স্বল্প দামে সীমিত আয়ের মানুষের মধ্যে বিতরণ করছি। ১ কোটি পরিবার টিসিবি'র ফেয়ার প্রাইজ কার্ডের মাধ্যমে ৩০ টাকা কেজি দরে চাল ও সাশ্রয়ীমূল্যে ভোজ্য তেল, ডাল ও চিনি ক্রয় করতে পারছেন। ৫০ লাখ পরিবার ১৫ টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি চাল কিনতে পারছেন। অসহায় মানুষদের ভিজিডি ও ভিজিএফ-এর মাধ্যমে ৩০ কেজি করে চাল প্রতিমাসে বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। হিজড়া, বেদে, মাস্তা, দলিত, হরিজন, কুষ্ঠরোগীসহ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মানুষের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি আমরা।

প্রিয় দেশবাসী,

গত ১৪ বছরে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। বাংলাদেশকে আজ আর কেউ বন্যা, খরা, দুর্যোগের দেশ হিসেবে দেখে না। বাংলাদেশ এখন উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। উন্নয়নের রোল মডেল।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতিসংঘসহ দুই ডজনেরও বেশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সংগঠনে বাংলাদেশ সক্রিয় সদস্য। গত অক্টোবরে ৫ম বারের মতো বিপুল ভোটে বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিটমহলবাসীর ৬৮ বছরের বন্দি জীবনের অবসান হয়েছে।

ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমানার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার মাধ্যমে আমরা বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকার ওপর স্বার্বভৌম অধিকার অর্জন করেছি। আমরা ১২ লাখের মতো রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি।

প্রিয় দেশবাসী,

এ বছরের শেষে অথবা সামনের বছরের শুরুতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এখন থেকেই স্বাধীনতাবিরোধী, ক্ষমতালোভী, জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনকারী আর পরগাছা গোষ্ঠীর সরব তৎপরতা শুরু হয়েছে। এদের লক্ষ্য ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পেছনের দরজা দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা। এরা লুণ্ঠন করা অর্থ দিয়ে দেশে-বিদেশে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী এবং বিবৃতিজীবী নিয়োগ করেছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরা মিথ্যে এবং ভুয়া তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এদের মিথ্যাচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরোধ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এমন কোনো উদ্ভট ধারণাকে প্রশ্রয় দিবেন না এবং ইন্ধন জোগাবেন না।

আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের প্রত্যাশা করছি। নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য বাংলাদেশে এই প্রথম একটি আইন পাস করা হয়েছে। সেই আইনের আওতায় সার্চ কমিটি করে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সরকার সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাবে।

আওয়ামী লীগ জনগণের দল, জনগণের শান্তিতে বিশ্বাসী, জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী। জনগণ ভোট দিয়ে বিজয়ী করলে আওয়ামী লীগ দেশ গড়ার জাতীয় দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে। যদি বিজয়ী না করে, তাহলে আমরা জনগণের কাতারে চলে যাব। তবে যেখানেই থাকি, আমরা জনগণের সেবা করে যাব।

কিন্তু ষড়যন্ত্র করে কেউ যাতে জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে, সেদিকে সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। একইসঙ্গে কেউ যাতে আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করে মানুষের জানমালের এবং জীবিকার ক্ষতিসাধন করতে না পারে, সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের দেশ এগিয়েছে অনেক। তবে আরও এগিয়ে নিতে হবে। একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন আমাদের লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নানা অনুষঙ্গ ধারণ করে আমরা তরুণদের প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি।

স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট গভার্মেন্ট, স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট শিল্প-কলকারখানা ও ব্যাবসাবাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে রোবোটিকস, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জৈব প্রযুক্তি অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। সকল ক্ষেত্রে গবেষণার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণ-বঞ্চনামুক্ত একটি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আসুন, স্মার্ট দেশ গড়ার মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলে আমরা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি। এদেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাই।

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

আপনারা সবাই ভালো থাকুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

আমির হোসেন আমু

১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭২ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি লাভ করে স্বপ্নের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসার মাধ্যমে সে বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এইদিন স্বাধীন বাংলা নতুন সূর্যালোকের মতো চির ভাস্বর-উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মহান নেতা ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধু বিহীন বাংলাদেশ তো কল্পনাতীত; সেটা তো হতো স্বাধীনতার অপূর্ণতা। ঐ সময় যখন বিভিন্ন দেশের কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, সংসদ সদস্য, আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্টের কর্মকর্তারা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করতেন, তারা শরণার্থীদের জিজ্ঞেস করতেন দেশ স্বাধীন হলে তারা ফিরে যাবে কি না। তারা বলতেন বঙ্গবন্ধু ফিরলে দেশে ফিরে যাব।

১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু মানুষের মুখে ছিল না কোনো হাসি, বিজয়ের তৃপ্তির ছাপ। শুধু জিজ্ঞাসা বঙ্গবন্ধুর খবর কী? বেঁচে আছেন কি না? আসবেন তো? ইত্যাদি।

এমনি এক সময় ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় খবর ভেসে আসল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে একটি বিশেষ বিমানে অজানার পথে। পরের দিন ৯ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু লন্ডনে হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান। ঐ দিন এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বাংলার মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীনতার অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে তখন আমি রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দিজীবন কাটাচ্ছি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। এদেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ অবিলম্বে জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য অনুরোধ জানাবে।'

পরিশেষে তিনি বলেন, 'আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই'। বিবৃতির শেষে সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন– আপনি আপনার বাংলাদেশে ফিরে যাবেন, সেই দেশ তো এখন ধ্বংসস্তূপ। তখন জাতির পিতা বলেছিলেন, 'আমার বাংলার মানুষ যদি থাকে, বাংলার মাটি যদি থাকে একদিন এই ধ্বংসস্তূপ থেকেই আমি আমার বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলায় পরিণত করব।'

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, ২৫শে মার্চ রাতের শেষ প্রহরের দিকে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করার পর ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, 'Sheikh Mujib is a traitor. This time he will not go unpunished.' সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর বিচার করে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমরা বিজয়ী হওয়ায় ইয়াহিয়ার কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ঐ রায় আর কার্যকর হয়নি।

জানা গেল, বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ফিরছেন। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর কমেট জেটটি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করলে সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা প্রদান করে বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কমেট জেটটি অবতরণ করলে তাঁর সম্মানে তোপধ্বনি করা হয়। অভ্যর্থনা জানান ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তারপর বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল সামাদ আজাদ, পালাম বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা এবং বঙ্গবন্ধু মিসেস গান্ধীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর, মিসেস গান্ধীর সাথে মত বিনিময় শেষ করে (যে মত বিনিময়ে মিসেস গান্ধীর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা নিয়েছিলেন) রওয়ানা হলেন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলার উদ্দেশে।

অবসান হলো লাখো মানুষের দীর্ঘ প্রতিক্ষার। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী কমেট জেট বিমানটি ঢাকার আকাশ সীমায় দেখার সাথে সাথে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত লাখো জনতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। লাখো মানুষের কণ্ঠে 'জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস।

বিমানের সিঁড়ি দেওয়ার সাথে সাথে অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ মন্ত্রিপরিষদ ও নেতৃবৃন্দ তাঁকে মাল্য ভূষিত করেন। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু কান্নায় ভেঙে পরেন। সে এক অভূতপূর্ব, অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। বঙ্গবন্ধু বিমান থেকে নেমে আসার সাথে সাথে তোপধ্বনি করে রাষ্ট্রপ্রধানকে বরণ করা হয়। বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয়। গার্ড অব অনার নেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দরে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিদেশি মিশনের সদস্য, মিত্র বাহিনীর পদস্থ সামরিক অফিসার, বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে করমর্দন শেষ করে যাত্রা শুরু করেন রেসকোর্সের উদ্দেশে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।

নেতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত দীর্ঘ চার মাইল বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বাংলাদেশের পতাকা নির্মাণ করে জাতির পিতাকে অভিবাদন জানায়। সুসজ্জিত তোরণ এবং সেই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের গগনবিদারি 'জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে স্বাধীন দেশের আকাশ-বাতাস হয় প্রকম্পিত। এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। স্বচক্ষে অবলোকন না করলে জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসার গভীরতা অনুধাবন করা অসম্ভব। এই দৃশ্য অভূতপূর্ব ছিল। আবেগপ্রসূত এই দৃশ্য অবিস্মরণীয় এবং ঐতিহাসিক।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাঙালি জাতির কাছে ছিল একটি বড়ো প্রেরণা। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য।

দীর্ঘ টানা ১৪ বছরের রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্ভীক, তেজস্বী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সফল রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশের নির্মাতা ও উন্নয়নের কাণ্ডারি, উন্নত, সমৃদ্ধ, মর্যাদাশীল বাংলাদেশ নির্মাণের রূপকার। শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে এবং দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে।

শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে পদ্মা সেতু প্রকল্প নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন হয়েছে ও ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ার মাধ্যমে জনগণের যাতায়াতের সুযোগ বৃদ্ধি হলো এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহু লেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প, দোহাজারী-রামু-ঘুমধুম রেল প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা বন্দর, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দরসহ মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। দেশবাসীর কাঙ্ক্ষিত মেট্রোরেল ইতোমধ্যে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ২৫টি জেলায় একশোটি সড়ক সেতু, ৫০টি জেলায় একশোটি মহাসড়ক, পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন, রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন, দেশের শতভাগ বিদ্যুতায়ন সুবিধা ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে। কমবেশি সাড়ে চার কোটি মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। দেশ এখন স্মার্ট ভূমি সেবার আওতায় এসেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম অর্থনীতির দেশ, যা আমাদের জন্য গৌরবের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফল রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্যমোচন, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, শিক্ষানীতি প্রণয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জঙ্গি দমন এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে বহু মর্যাদাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বে মর্যাদার নতুন মাত্রা দিয়েছেন। শেখ হাসিনা আজ বিশ্বে একজন নন্দিত সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি সৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, চার মূলনীতি সংবিধানে পুনঃঅন্তর্ভুক্ত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের এবং যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচার অনুষ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে পাপ মুক্ত করেছেন তিনি।

বর্তমানে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা পরিস্থিতি এবং পাশাপাশি উপর্যুপরি বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলা করে বিশ্ব দরবারে সমাদৃত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। তাঁর ঘোষিত ২০৪১ সালের আগেই উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার প্রতিফলন ঘটবে। আমি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আমির হোসেন আমু: এমপি, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী
সৌজন্যে: পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে 'পদ্মা সেতু' উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

নতুন বছর: চ্যালেঞ্জও নতুন

মোনায়েম সরকার

আরও একটি বছর পার করে ইতোমধ্যে আমরা নতুন বছরে পদার্পণ করেছি। পেছনে তাকালে দেখতে পাই, সবকিছু মিলিয়ে আমরা সংকট মোকাবিলা করে সম্ভাবনার দিকেই এগিয়ে চলেছি। বিগত বছরে করোনা মহামারি আমাদের আগের মতো ভোগায়নি, তবে এর রেশ ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে করোনা মোকাবিলায় আমরা সাফল্যও কম পাইনি। এক্ষেত্রে নানা ধরনের শঙ্কা ও প্রচারণা মোকাবিলা করে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকাদানে সরকারের কার্যক্রম গেল বছরও অব্যাহত ছিল। আন্তর্জাতিকভাবেও এ কাজে সফলতার স্বীকৃতি মিলেছে। গেল বছর বন্যা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কাও ছিল। তাতে ফসলহানি হলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, সেই শঙ্কা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির তেমন অবনতি হয়নি। হলেও বন্যা মোকাবিলায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা দিয়ে নতুন পরিস্থিতিও মোকাবিলা করতে পারতাম। এর মধ্যেই বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু চালু করে দেওয়ার কাজটি সরকার করতে পেরেছে। এটি আমাদের সবচেয়ে বড়ো উন্নয়ন প্রকল্প। এটি শুধু একটি প্রকল্প নয়, স্বপ্নের বাস্তবায়ন। আমরা সবাই জানি, কত প্রতিকূলতার মধ্যে সরকার পদ্মা সেতু প্রকল্প নিয়ে এগিয়েছে এবং অবশেষে তা বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। বছরের শুরুতে তিক্ত আলোচনা করতে চাই না বলে এখানে আর সে অভিজ্ঞতার পুনরুল্লেখ করছি না। শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশ তার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মার মতো একটি অবাধ্য নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করেছে এবং তা সম্ভব হতো না পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর সাহস, দৃঢ়তা ও দূরদৃষ্টি না থাকলে। পদ্মা সেতু চালু হয়ে যাওয়ার ফলে শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার জনজীবনে নয়, সারা দেশের অর্থনীতিতেও পড়বে ইতিবাচক প্রভাব। এ প্রকল্পে রেললাইন সংযোজনের কাজও এগিয়ে চলেছে।

গেল বছর সরকার অবশ্য কিছু অর্থসংকটে পড়ে। রাজস্ব আদায়ে সব সরকারের আমলেই ব্যর্থতা লক্ষ করা গেছে। তবে কোনো সময়েই বিদেশি অর্থ সহায়তা পেতে আমাদের বেগ পেতে হয়নি। কারণ এ ধরনের ঋণ পরিশোধে আমাদের ব্যর্থতার নজির নেই। বছর শেষে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে কিছু সংকট দেখা দেয় মূলত ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে। জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে, বিশ্ববাজারে খাদ্যের দামও বেড়ে যায় আকস্মিকভাবে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ দ্রুত বন্ধ না হওয়ায়। ইউক্রেন ঘিরে রাশিয়ার আগ্রাসী মনোভাবের পাশাপাশি আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো জোটের উসকানিও এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। এর মূল্য দিতে শুরু করেছে বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো। বিগত বছরে আমাদের অর্থনীতি ও জনজীবনে যে সংকট দেখা দেয়, তার জন্য দেশের বাইরের ঘটনাগুলোই বেশি দায়ী। এর মধ্যেও সরকার চেষ্টা করছে আমদানি-রপ্তানি স্বাভাবিক রেখে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে। বছরের শেষদিকে এখানে যে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছিল, সেটাও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে সরকার। এর বেড়ে চলা চাহিদা পূরণে সরকার কিছু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল। তাতে একটা সময় পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে উত্তরণের দিকে যেতে থাকার সময় কেন এমন সংকট দেখা দিলো, তা অবশ্য অনুসন্ধানের বিষয়। বিদ্যুৎ খাতে অপচয়-দুর্নীতির কথা অনেকে বলে থাকেন এবং গেল বছর এ সমালোচনা আরও বেড়েছিল স্বভাবতই। বেসরকারি খাতের সঙ্গে অনেক আগে করা চুক্তিগুলো নিয়েও অনেক কথা শুনতে হয় সরকারকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেই তার জবাব দিতে হবে। মানুষ সরকারের গৃহীত উদ্যোগের সুফল পেলে বিগত দিনের ক্ষতির কথাও ভুলে যায়, এটা অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে। নতুন বছরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়াসহ অন্যান্য উদ্যোগ সফল করতে পারলে এ খাতে অবশ্যই আস্থা ফিরে আসবে। গেল বছরটি সরকার অবশ্য শেষ করেছে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর নীচে টানেল নির্মাণকাজ এগিয়ে নিয়ে এবং রাজধানীতে বহুল প্রত্যাশিত মেট্রোরেল উদ্‌বোধন করে। উপমহাদেশে টানেলের অভিজ্ঞতা এই প্রথম হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে এবং মেট্রোরেলও এ সরকারের মাধ্যমেই জনগণের একটি অর্জন। সড়ক যোগাযোগ সহজ করার মাধ্যমে জনজীবনে গতি সঞ্চারের চেষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার করে যাচ্ছে দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই। গেল বছরে এক্ষেত্রে অর্জনগুলো দৃশ্যমান হয়েছে কেবল।

নতুন যে বছর এসেছে, তার পরের বছরের শুরুতেই পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও দৃশ্যমান হবে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সে নির্বাচন সফলভাবে মোকাবিলার প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছে। গেল বছরের শেষদিকে দলের কাউন্সিল সম্পন্ন করা তারই অংশ। এতে পুরনো নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেছেন সভানেত্রী

শেখ হাসিনা। এ নেতৃত্বকেই আগামী নির্বাচনি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। গেল বছরের মধ্যভাগ থেকে বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলো আবার রাজনীতির মাঠ গরম করতেও তৎপর হয়ে উঠেছে। বিএনপির সঙ্গে তার সব সময়ের মিত্র জামায়াতে ইসলামিসহ মৌলবাদী দলগুলো রয়েছে– প্রকাশ্যে ততটা না হলেও কৌশলে। দলটির সঙ্গে নতুন করে যোগ দিয়েছে সাবেক বাম, মধ্যবাম কিছু গ্রুপ। অনলাইনে দেশে-বিদেশে সক্রিয় একটি গোষ্ঠীও সরকারের সমালোচনা অব্যাহত রেখেছে। সমালোচনায় কারও আপত্তি হওয়ার কথা নয়, তবে অপপ্রচারে আপত্তি রয়েছে। গেল বছর আমরা লক্ষ করেছি, জনজীবনে সৃষ্টি হওয়া কিছু সমস্যা নিয়ে দেশে যেমন বিরোধী দলগুলো সক্রিয় হয়ে উঠতে চেয়েছে, তেমনি অনলাইনে সক্রিয় একটি গোষ্ঠী মেতে উঠেছে অপপ্রচারে। রিজার্ভ পরিস্থিতি ও ব্যাংক খাতের কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিয়ে তারা এত অপপ্রচার চালায়, যা মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। দেশ অচিরেই শ্রীলংকা হয়ে যাবে বলে প্রচারণা চালিয়ে অবশ্য কোনো সুফল তারা পায়নি। দেশ শ্রীলংকা হয়নি, বরং এরই মধ্যে আইএমএফের একটি মিশন এসে সরকারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হয়ে বড়ো অঙ্কের ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে। এটা বিদ্যমান সংকটে যত না, তার চেয়ে বেশি সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলায় আমাদের সহায়তা করবে। তবে একথা ঠিক, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কোনো কোনো ব্যাংকে সংকট তৈরি করছে এবং তারা দেশ থেকে অর্থ পাচারেও জড়িত। এদের দমনে প্রধানমন্ত্রীকেই উদ্যোগী হতে হবে। নতুন বছরে যত দ্রুত এ পদক্ষেপ নেওয়া হবে, ততই আস্থা ফিরে আসবে মানুষের মনে। এর প্রভাব বিরোধী দলের আন্দোলন রচনার মধ্যেও গিয়ে পড়বে। তাদের আন্দোলনের সুযোগ আসে প্রধানত সরকারের কিছু সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতা থেকে এবং বাংলাদেশ ঘিরে তৎপর প্রভাবশালী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রশ্নবিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে। গেল বছর শেষে আমরা একটি প্রভাবশালী দেশের রাষ্ট্রদূতের অতি তৎপরতা দেখে চিন্তিত হয়েছি। এর প্রতিক্রিয়ায় আবার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের তৎপরতাও দেখতে পেয়েছি। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে– গণতন্ত্র, নির্বাচন ও মানবাধিকারের মতো বিষয়ে বাইরের কোনো দেশের রীতিবিরুদ্ধ কথাবার্তা ও কার্যকলাপ বাংলাদেশ পছন্দ করে না। তাদেরকে কূটনৈতিক রীতিনীতি মান্য করে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরকে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরও সতর্ক থাকতে হবে। অনেকে মনে করেন, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলো পরস্পরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একটি ক্ষেত্র করে তুলতে চায় বাংলাদেশকে। বলাই বাহুল্য, দীর্ঘদিন ধরে সচেষ্ট থেকেও কার্যকর আন্দোলন রচনায় ব্যর্থ বিরোধী দল এর সুযোগ নিতে চাইবে। নতুন বছরে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে সরকারকে। এটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের জন্যও একটি পরীক্ষা। সামনে তাদের কেবল নির্বাচন নয়, সম্ভাব্য আন্দোলনও মোকাবিলা করতে হবে। বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর কোনো জনসমর্থন নেই, তা নয়। আওয়ামী লীগ নজিরবিহীনভাবে টানা তিন মেয়াদ ক্ষমতায় থাকায় তার জন্য কিছু জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং সেটা স্বাভাবিকও বৈকি। প্রধানমন্ত্রীসহ দলের প্রথম সারির নেতারা প্রকাশ্যে একাধিকবার বলেন, আগামী নির্বাচন আগেকার মতো সহজ হবে না। বিরোধী দলগুলো নির্বাচনকালে যে ধরনের সরকারের দাবি জানিয়ে যাচ্ছে, তেমন ব্যবস্থা না হলেও আগামীতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন আয়োজনের দাবি আন্তর্জাতিকভাবেও জোরালো হয়ে উঠেছে। সরকারও চায় সবার অংশগ্রহণে একটি অর্থবহ নির্বাচন। সে নির্বাচনে জয়ী হয়ে উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে হবে ক্ষমতাসীন দলকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ করার উচ্চাভিলাষের কথা সামনে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেটি অর্জনের জন্য স্মার্ট সরকার ও প্রশাসন প্রয়োজন হবে এবং দলকেও সেভাবে প্রস্তুত করতে হবে। শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিয়োজিত থাকলে চলবে না, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে হবে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলকে। সংগঠনকে সচল ও রাজনৈতিক কর্মসূচিভিত্তিক কাজ বাড়াতে হবে তৃণমূল পর্যন্ত। শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে জনগণ কেন ভোট দিয়ে আরেক দফায় ক্ষমতায় আনবে, তা স্পষ্ট করতে হবে শুধু কথায় নয়– কাজে। বিরোধী দল তাদের মনমতো নির্বাচনের দাবিতে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইলে সেটা যেমন হতে দেওয়া যাবে না, তেমনি তাদের সমালোচনা ও অপপ্রচারের যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে হবে। পাশাপাশি দুর্নীতি দমন ও সুশাসন নিশ্চিত করে জনগণকে আশ্বস্ত করতে হবে জনকল্যাণের বিষয়ে। অর্থনীতিতে যেসব সংকট রয়েছে, সেগুলো মোকাবিলায় পদক্ষেপও আরও জোরালো করা চাই। বেকারত্ব হ্রাস ও আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা গেলে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসতে সময় লাগবে না। তাতে সরকারের ওপর আস্থাও বাড়বে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত আরও শক্তিশালী হবে এতে।

মোনায়েম সরকার: রাজনীতিবিদ, লেখক, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, bfdrms@gmail.com

সাফল্যের অগ্রযাত্রায় আরও একটি বছর

৭ জানুয়ারি ২০২৩

সরকারের বর্ষপূর্তি

গতিময় বাংলাদেশ

ড. আতিউর রহমান

নানা সংকট মোকাবিলা করেই এগিয়ে চলেছে গতিময় বাংলাদেশ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ উতরে বাংলাদেশের এই সাহসী অভিযাত্রা নিঃসন্দেহে আশা-জাগানিয়া। প্রথমে করোনা, আর তারপর সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বিশ্ব অর্থনীতি আরও বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে। বিশ্বায়িত ব্যবস্থার কারণে বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশও যে এই সংকটের প্রভাব বলয়ের মধ্যে পড়েছে তা সবার জানা। একইসঙ্গে এটাও সবার জানা গত এক যুগের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে কল্যাণমুখী ও প্রবৃদ্ধি-সহায়ক নীতি গ্রহণের কারণে বাংলাদেশ করোনা সংকট মোকাবিলায় যেমন ভালো করেছে, একইভাবে চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও অন্য অধিকাংশ দেশের তুলনায় বেশ ভালো করছে। সাম্প্রতিক সংবাদে দেখা যাচ্ছে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ এক মাসে সর্বোচ্চ ৬ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সমমানের পণ্য ও সেবা রপ্তানি করেছে। অর্থাৎ এই ধারা ধরে রাখা গেলে বার্ষিক শুধু ৫৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবই নয় এর থেকেও অনেক বেশি রপ্তানি করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, গত নভেম্বরে তা পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বিনিময় হার নমনীয় করায় এই সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে। তবে রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ধারাটি যে কোনো মূল্যে অব্যাহত রাখতে হবে। একই রকম আশাব্যঞ্জক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রেও। জুলাই মাসের হিসাব বলছে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এবারে ১২ শতাংশের বেশি প্রবাসী আয় দেশে ঢুকেছে। এরপর মাস দুয়েক প্রবৃদ্ধি স্থথ থাকলেও ডিসেম্বরে তা দুই বিলিয়ন ডলারের আশপাশেই থেকেছে। আশা করা যায় প্রবাসী আয়ের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। চলমান বৈশ্বিক সংকটকালে ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই যখন সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ সে সময় এ খবরগুলো নিশ্চয়ই আশাব্যঞ্জক। ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় আমাদের নীতি-নির্ধারকদের আগের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে তার ভিত্তিতে এবারে একেবারে শুরু থেকেই তারা নানামুখী পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের অর্থনীতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, কম অগ্রাধিকারের ব্যয় কাটছাট করা– এমন নানামুখী উদ্যোগ তারা নিয়েছেন। এর সুফল হিসেবেই আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে স্থিতিশীলতা দেখতে পাচ্ছি। অযথা আশঙ্কা ছড়ানোর ফলে মাঝখানে জনমনে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দেওয়ায় অনেকেই সঞ্চয় ভেঙে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন শুরু করেছিলেন। আস্থা ফেরাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু সময়োচিত পদক্ষেপ আমরা দেখেছি। আর তাই ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ এই প্রবণতায় ভাটা পড়েছে। এ কারণে ২০ ডিসেম্বর ২০২২– এই একদিনেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে ফিরেছে ৯৩১ কোটি টাকা। তাই বিশ্বব্যাংকসহ অন্য উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আগে যেমনটি আশা করেছিল তা থেকে হয়ত কিছুটা কম হলেও আমাদের প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশের কম হবে না বলে সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। এই হার বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় অনেকখানি বেশি। এখন প্রবৃদ্ধি নিয়ে অতিরিক্ত মাথা না ঘামিয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করাই বেশি দরকারি। সে বিচারে প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে রাখতে পারাটিই হবে বড়ো অর্জন।

এটা আসলেই স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই একের পর এক বড়ো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও এ দেশের অর্থনীতি সম্ভাবনাময় পথ-পরিক্রমা অব্যাহত রাখতে পারছে। এই প্রক্রিয়ার পেছনের শক্তির জায়গাগুলো বোঝা যেমন জরুরি, একইভাবে এর ফলস্বরূপ আগামী দুটি দশকে বাংলাদেশের জন্য যে সব সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সেগুলোও অনুধাবন করা একই রকম দরকারি। মোটা দাগে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই আশাসঞ্চারী পথ-পরিক্রমাকে আমরা দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্যায়টির শুরু ২০০৮-০৯ থেকে। ঐ সময় আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও ভিশন এবং এগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড়ো পরিবর্তন (বলা যায় 'প্যারাডাইম শিফট') লক্ষ্য করতে পারি। গতানুগতিক উন্নয়ন ভাবনা এবং পরনির্ভর প্রবৃদ্ধি-কেন্দ্রিক নীতি-কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে ঐ সময়ে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে যতোটা সম্ভব কল্যাণমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করাকে কেন্দ্রীয় নীতিবিবেচনার জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। 'দিন বদলের সনদ' শিরোনামে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের যে রূপরেখা সে সময়টায় দেওয়া হয়েছিল তারই সুফল আমরা এখন বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং নিজস্ব উৎপাদন সম্ভাবনার মধ্যকার পরিপূরক সম্পর্কটির ওপর জোর দিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পথনকশা দাঁড় করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে কৃষি, এমএসএমই, প্রবাসী আয় এবং রপ্তানিমুখী শিল্প- এই খাতগুলোর বিষয়ে নতুন করে ভাবা হয়েছে। ফলে কৃষির নতুন ধারার বিকাশের কারণে একদিকে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলোর আয় বেড়েছে, অন্যদিকে বাড়ন্ত আয় তাদের ভোগে ইতিবাচক প্রভাব ফেলায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা আরও বলশালী হয়েছে। বাড়ন্ত ও বহুমুখী আধুনিক কৃষি দেশের বর্ধিষ্ণু এমএসএমই এবং শিল্প খাতের জন্য উপকরণ এবং চাহিদা দুইই নিশ্চিত করেছে। মূলত দেশজ চাহিদার ওপর ভর করে বাড়তে থাকা এমএসএমই খাত কর্মসংস্থানে রেখেছে ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা। কোভিডকালে এই খাত বড়ো ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ এবং পরিশ্রমী ছোটোখাটো উদ্যোক্তাদের লেগে থাকার প্রচেষ্টা এই খাতকে ফের ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে ব্যাংকিং খাতও এ সব উদ্যোক্তাদের অর্থ ও সাহস- দুইই যুগিয়েছে। অন্যদিকে রপ্তানিমুখী শিল্পগুলো তুলনামূলক তরুণ এবং সস্তা শ্রমশক্তির জোরে বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতা বাড়ার পরও আগের তুলনায় ভালোই করেছে। আর বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে আমদানি বাবদ ব্যাপক খরচ করতে হলেও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ তা ব্যালেন্স করতে সহায়তা করেছে। নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক সংকটগুলোর কারণে এই ভারসাম্য কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। তবে আগেই উন্নয়নের এই নতুন পথ-পরিক্রমার প্রথম পর্যায়টি শেষের পথে। এই ধাপে বাংলাদেশ নিজের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থান সুসংহত করার পাশাপাশি নাগরিকদের জন্য মৌলিক সুরক্ষাগুলো নিশ্চিত করে এগিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়টি হবে একটি বড়ো উল্লম্ফনের (বলা যায় 'কোয়ান্টাম জাম্প')। গত এক যুগের বেশি সময় ধরে যে সম্ভাবনাগুলো তৈরি করা গেছে, সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে এ পর্যায়ে। আর তা করা গেলেই আগামী দুই দশকে এ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি এবং জনগণের জীবন মানের ক্ষেত্রে বড়ো উল্লম্ফন ঘটানো সম্ভব হবে। নতুন পথ-পরিক্রমায় যে ভিত্তি রচিত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তি পর্যায়ের এই উল্লম্ফন ঘটবে। আর এ ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত তো ভূমিকা রাখবেই। আর নেতৃত্ব নেবে আমাদের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি খাত। তবে ব্যক্তি খাতের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্বটি সরকারের। আর সেই পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো অবদান রাখবে গত এক যুগের বেশি সময় ধরে অবকাঠামো খাতে সরকারের ধারাবাহিক বিনিয়োগ। আমরা লক্ষ্য করেছি এ সময়কালে জাতীয় বাজেটে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত গড়ে বাজেটের ১০ শতাংশের বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। এবং সব সময়ই প্রধান অগ্রাধিকার খাতগুলোর অন্যতম হিসেবে থেকেছে। সর্বশেষ চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতের জন্য প্রায় ১২ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের এই বরাদ্দ দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ তো বটেই দক্ষিণ এশিয়া (বিশেষ করে বিবিআইএন) অঞ্চলে যোগাযোগ বৃদ্ধিতেও বিশেষ সহায়ক হয়েছে এবং হবে। আর তাতে সুবিধা পাবেন কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উদ্যোক্তারা। আর চূড়ান্ত সুফল ভোগ করবেন এসব পণ্য ও সেবার ভোক্তা যারা সেই সাধারণ নাগরিকেরা। বিশেষ করে পদ্মাসেতু, কালনা সেতু, এসইজেড, এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেলের মতো মেগা প্রজেক্টগুলোর সরাসরি সুফল ভোগ করবেন ৩৩ শতাংশ নাগরিক। পোর্ট হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ৭০ শতাংশ বাড়বে। আর এর ফলে মালামাল খালাসের সময় অর্ধেকে নেমে আসবে (৪০ দিন থেকে কমে ১৬ দিন হবে)। বৃহৎ কানেক্টিভিটি প্রকল্পের প্রতিটি জিডিপিতে ১.২ শতাংশ যোগ করতে পারে।

সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, এবং থাইল্যান্ড ৮০-৯০ দশকে মাথাপিছু আয় ২,৪০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার পর যে পথে এগিয়ে ঐ মাথাপিছু আয়কে ৪,০০০ ডলারের ওপর নিয়ে গেছে, এই দশকে বাংলাদেশও সে পথে এগুনোর সম্ভাবনা তৈরি করেছে (বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২,৮০০ ডলার ছাড়িয়েছে)। এ পথে এগিয়ে যেতে পারলে ২০২৬-এর মধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৪,০০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। পূর্ব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মাননা

❖ টিকা চ্যাম্পিয়ন

বিনামূল্যে করোনা টিকা কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জার্মানি এবং ভ্যাকসিন অ্যালায়েন্স Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) আয়োজিত Gavi COVAX AMC Summit : Break COVID Now-2022 শীর্ষক ভার্চুয়াল সম্মেলনে এ সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

❖ গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ডায়াবেটিস সম্মেলনে ডায়াবেটিস আক্রান্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের চিকিৎসাসহ অন্যান্য বিষয়ে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রথম 'গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২২ সালে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন

- স্বপ্নের পদ্মাসেতুর উদ্বোধন
- দেশবাসীর কাঙ্ক্ষিত প্রথম মেট্রোরেলের উদ্বোধন
- দেশের ২৫টি জেলায় একযোগে ১০০টি সড়ক সেতুর উদ্বোধন
- দেশের ৫০টি জেলায় একযোগে ১০০টি মহাসড়কের উদ্বোধন
- দেশে একযোগে ৫০টি শিল্প ও অবকাঠামোর উদ্বোধন
- পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন
- পদ্মার বুকে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন উদ্বোধন
- রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন
- দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪২১টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ
- দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু
- দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সুবিধা নিশ্চিত
- প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নারী সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন
- ই-জিপিতে সরকারের সাশ্রয় ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- বছরের প্রথম দিনে ৩৩ কোটি ৯১ লাখেরও বেশি বই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ
- দেশ এখন স্মার্ট ভূমি সেবার আওতায়
- সরকারি ভিডিও কনফারেন্স সফটওয়্যার 'বৈঠক' সবার জন্য উন্মুক্ত
- কোভিড-১৯ টিকাদানে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম এবং সারা বিশ্বে পঞ্চম
- বিশ্বে বাংলাদেশ এখন ইলিশ মাছ আরোহণে ১ম, পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়, ধান (টানা চারবার), সবজি, স্বাদু পানির মাছ এবং পিয়াজ উৎপাদনে ৩য়
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ই-গেট চালু
- দেশের আদালত সমূহে পরীক্ষামূলকভাবে 'মাইকোর্ট' অ্যাপ চালু
- ২ হাজার ৪২৫টি নাগরিক সেবার মধ্যে ১ হাজার ৮৫১টি ডিজিটাল সেবা সবার জন্য উন্মুক্ত
- ৭ লক্ষ ১১ হাজার ২৬৩টি পরিবারকে বিনামূল্যে জমি ও গৃহ প্রদান। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৫ হাজার ৩১৫ জন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন ও সাফল্যের কিছু তুলনামূলক চিত্র

সাফল্য/অর্জন	২০২২ সাল	২০০৬ সাল
বাজেট	৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা	৬১ হাজার ৬ কোটি টাকা
জিডিপি বৃদ্ধি	৭.৫ শতাংশ	৫.০৪ শতাংশ
জিডিপির আকার	৪০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি	৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা
মাথাপিছু আয়	২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার	৫৪৩ মার্কিন ডলার
শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার	শিশু মৃত্যুর হার ২১ (প্রতি হাজারে), মাতৃ মৃত্যুর হার ১.৬৫ (প্রতি লাখে)	শিশু মৃত্যুর হার ৫০ এবং মাতৃ মৃত্যুর হার ৩.৪৮

যেমনটি বলেছি- সংকট শুরুর অনেক আগে থেকেই এই নতুন ধারার সামাষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে এগুনোয় একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করা গেছে। তাই সংকটও সামাল দেওয়া গেছে তুলনামূলক ভালোভাবেই। ধীরে হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্জাগরণের পথেই আছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির নব পথ-পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ের সুফল তো খালি চোখেই দৃশ্যমান। এখনও বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। গত এক যুগের বেশি সময়ে গ্রামাঞ্চলের জীবন মানে নাটকীয় পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। দারিদ্র্যের হার আগের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগে নামিয়ে আনা গিয়েছে (২০ শতাংশের আশপাশে)। কৃষি উৎপাদন বহু গুণে বেড়েছে। কৃষি শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে পাঁচ থেকে দশ গুণ। বিদ্যুৎ সংযোগ, মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বেড়েছে আশাতীত হারে। ফলে গ্রামীণ জীবনমান বেড়েছে ঈর্ষণীয় মাত্রায়। আইসিটি ডিভিশন এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক ও আনসার-ভিডিপি ব্যাংকগুলোর মতো উন্নয়নমুখী ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে নানাভাবে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্টার্ট-আপগুলোকে যে সহায়তা দিচ্ছে তার ফলে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছেন এবং তারা অন্য অনেকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করছেন। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছে সেগুলোও আলাদা করে উল্লেখ করার মতো। সর্বোপরি কৃষির বাইরে তবে সংশ্লিষ্ট অ-কৃষি খাতে গ্রামাঞ্চলেও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ আয়ের বড়ো অংশটিই এখন আসছে এই অ-কৃষি খাত থেকে। এই খাতের সাথে কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের পণ্য বিকিকিনির গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করার মতো। সড়ক, সেতু এবং রেলের সংযোগ বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো গ্রাম এখন নগরের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে। একইসঙ্গে মানুষের নিজেদের উদ্যোগ, সামাজিক পুঁজির প্রয়োগ এবং অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয়তার কথাও ভুললে চলবে না। রাষ্ট্র এদের বিকাশে বরাবরই সহায়ক থেকেছে। অংশগ্রহণমূলক কাজে তাদের সুযোগ করে দিয়েছে। ব্যক্তি খাতও কিন্তু পিছিয়ে নেই। গ্রামেও এখন সেবা খাতের তৎপরতা প্রায় সমান দৃশ্যমান। চায়ের দোকান, কফি শপ, রেস্তোরা, সেলুন, বিউটি পার্লার, কিডারগার্টেন স্কুল, কোচিং সেন্টার, হেলথ ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার, সাইবার ক্যাফের উপস্থিতি এখন গ্রামাঞ্চলেও খুব স্বাভাবিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে ঠিকই। তবে প্রযুক্তির কল্যাণে কৃষির উৎপাদনশীলতাও বেড়েছে। তাছাড়া, সেবা খাতের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তা সামাল দেওয়া গেছে ভালোভাবেই। পরিসংখ্যান বলছে এখন গ্রামীণ আয়ের ষাট শতাংশ আসে অ-কৃষি খাত থেকে। নানামাত্রিক উদ্যোক্তারা এই অ-কৃষি খাতের সাথে যুক্ত। তরুণ শিক্ষিত উদ্যোক্তারা বিশেষ করে ডিজিটাল উদ্যোক্তারা এই খাতে এখন বেশি বেশি যুক্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে কোভিডকালে এদের অনেকেই গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন। অ-কৃষি খাতের এই উন্নতির পেছনে কৃষি খাতের ভূমিকাও কম নয়। উপকরণ সরবরাহ ও চাহিদার যোগান দিয়ে কৃষি অ-কৃষি খাতকে চাঙ্গা রাখছে। বলা যায় চাঙ্গা গ্রামীণ অর্থনীতি এখন দু'পায়েই হাঁটছে।

তবে এখনও মোট শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশ কৃষি খাতেই নিযুক্ত আছে। ভবিষ্যতেও এ খাতে শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যুক্ত থাকবে তা বোঝা যায়। সরকারও তাই কৃষির দিকে নীতি মনোযোগ অব্যাহত রেখেছেন। ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি বাজেটে কৃষি খাতে বাড়তি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য নীতি-নির্ধারকরা বিশেষ মনযোগ দিয়েছেন কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়নে। শিক্ষিত তরুণারও তাই আজকাল নতুন করে কৃষির দিকে ঝুঁকছেন। কৃষি গবেষণায় বেশি বেশি নীতি সমর্থন থাকায় নতুন নতুন জাতের ধান, গম, ভুট্টা ও সবজির উৎপাদন বেড়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ১৩টি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়া ২০১৩ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো জিংক-সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেন আমাদের কৃষি গবেষকরা। এর বাইরে পাটের কয়েকটি নতুন জাত উদ্ভাবনের পাশাপাশি পাটের জীবন রহস্যও উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কৃষিতে এমন বিপ্লবের ফল হিসেবেই ১৯৭২-এর তুলনায় আজ আমাদের মোট ফসলের উৎপাদন ৪ গুণেরও বেশি। আমরা জানি যে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জীবন মানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার পেছনে কাজ করেছে কৃষির আধুনিকায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অ-কৃষি খাতের বিস্তার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার, এবং সর্বোপরি প্রাবসী আয় বৃদ্ধি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারের বিনিয়োগ, দারিদ্র্যবিমোচন ছাড়াও রপ্তানি শিল্পে পর্যাপ্ত নারী শ্রমশক্তি সরবরাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে এ সবগুলো শক্তিকে একসূত্রে গাঁথতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে সরকারের যথাযথ নীতি সহায়তা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তির গতিশীল অভিযান। এক দশক আগে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযান শুরু করেছিলাম তার পেছনে মূল ভাবনাটিই ছিলো সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগণের কাছে আরও সহজে কি করে উপযোগী আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। বলা চলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির এই অভিযানে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আজ অনেকটাই সফল। মোবাইল আর্থিক সেবা, এজেন্ট ও ডিজিটাল ব্যাংকিং-এর কল্যাণে বাংলাদেশের অতি সাধারণ মানুষও আজ তাদের মতো করে আর্থিক সেবার সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে ছোটোখাটো উদ্যোক্তাদের কর্মচাঞ্চল্য বেড়েছে। আর প্রবৃদ্ধি হয়ে পেড়েছে গতিময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক।

গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে নতুন ধারার উন্নয়ন চিন্তায় পরিচালিত বাংলাদেশের অর্জনগুলো সামাষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো থেকেই টের পাওয়া যায়। ২০০৮-০৯ থেকে এখন পর্যন্ত বর্তমান মূল্যে জিডিপি সাড়ে চার গুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার। এ সময়ের ব্যবধানে বার্ষিক রপ্তানি তিন গুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থবছর শেষে তা ষাট বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। প্রবাসী আয় প্রবাহ বেড়েছে ২ গুণেরও বেশি। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমদানি মূল্য বেশি হারে বাড়ায় লেনদেনে সাময়িক কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হলেও এই টানাপোড়েন সামলে নেবার সক্ষমতা বাংলাদেশের যে রয়েছে তার প্রমাণও মিলছে। অর্থনীতির গতি যেমন বেড়েছে, এটির ঘাতসহতাও বেড়েছে। তার প্রমাণ সঞ্চয়-জিডিপির অনুপাত ২৫ থেকে ৩১ শতাংশের মধ্যে থাকা। বেশি বেশি সঞ্চয় হয়েছে বলেই চলমান সংকটকালে সেই সঞ্চয় ব্যবহার করে সংকট মোকাবিলা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে নানারকম চ্যালেঞ্জ থাকার পরও বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তাই বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩২ শতাংশ হয়েছে। বাস্তব কারণেই বহিঃস্থ উৎস থেকে ঋণ করতে হয়েছে। তবে টাকার অঙ্কে ঋণের পরিমাণ বাড়লেও জিডিপির শতাংশ হিসেবে বহিঃস্থ ঋণ ২৫ শতাংশ থেকে কমে ২১ শতাংশ হয়েছে। সরকারি বিদেশি ঋণ এখনও জিডিপির পনেরো শতাংশের নীচে। অর্থাৎ অর্থনীতির আকার যে হারে বেড়েছে সে তুলনায় বহিঃস্থ ঋণ বাড়েনি। এটি দেশজ অর্থনীতির স্বনির্ভরতার সূচক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এহেন ট্র্যাক রেকর্ডের কারণেই চলমান বিশ্ব সংকটকালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সহজ শর্তে সস্তা ঋণ পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী হওয়া যায়। ইতোমধ্যে আইএমএফ, এডিবি, বিশ্বব্যাংকসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেবার উপযুক্ত উদ্যোগ নিয়েছে।

এশিয়ার অর্থনীতিগুলোতে মাথাপিছু আয় ২,৪০০ ডলার থেকে বেড়ে ৪,০০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় জিডিপির শতাংশ হিসেবে ভোগ বেড়েছিল ১২ শতাংশের মতো। বাংলাদেশে এখনই জিডিপির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসছে ভোগ থেকে। কাজেই আশা করা যায় ২০২৬ সালের মধ্যে জিডিপির শতাংশ হিসেবে ভোগের অংশ আরও ১০-১২ শতাংশ বাড়বে।

বাংলাদেশের এহেন সম্ভাবনাগুলোর বিচারে আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা বোস্টন কনসালটেন্সি গ্রুপ বলছে প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কের ঘরে থাকলে ২০৩০-এর মধ্যে এ দেশের জিডিপির আকার ১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। আর যদি প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশও হয়, তবুও ২০৪০-এ অর্থনীতি ১ ট্রিলিয়ন ছাড়াবে। ২০২০ সালে মধ্যম ও উচ্চ আয় শ্রেণিতে থাকা নাগরিকের সংখ্যা ১৯ মিলিয়ন। ২০২৫ সালে বেড়ে হবে ৩৪ মিলিয়ন। উচ্চতর আয় শ্রেণিতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, তাদের চাহিদাও তত বাড়বে। ফলে বাজার হিসেবে বাংলাদেশের সম্ভাবনাও বাড়বে। আর এর ফলে গত ১০-১২ বছরে যে গতিতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে আগামীতে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হারে বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশা করা যায়। আর এই প্রত্যাশার ভিত্তি তৈরি করেছে সরকারের ধারাবাহিকতা এবং স্বপ্ন-সঞ্চারী নেতৃত্ব। এই নেতৃত্বেই বর্তমানে জলবায়ু সহিষ্ণু, দক্ষ জনশক্তিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক গতিময় এক স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে নিবেদিত। আশার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করে আমরা তাই ২০৪১ সালের আগেই পৌঁছে যেতে চাই এক-ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের মাইলফলকে। আর এই স্বপ্নযাত্রায় দক্ষ ও নিবেদিত নেতৃত্বের পরম্পরার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের এই নতুন পথ-পরিক্রমার বর্তমান এবং আগামী দুটোই আশাসঞ্চারী– এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা এই আশা-ভরসার ভিত্তি আমাদের নিজস্ব। পরনির্ভর নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, বাংলাদেশ এগুচ্ছে 'আত্মশক্তি'র ওপর ভিত্তি করেই। তাই এই আশা-ভরসা আর সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার বিষয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী হতেই পারি। নিশ্চয় আগামী আলোক-উজ্জ্বল দিন বাংলাদেশের। ❑

*লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	১৮ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। বিনা মূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ প্রদান	কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এমনকি চালু কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোও বন্ধ করা হয়েছিল
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সরকারে ২৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বাস্তবায়ন করছে এই খাতে সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করছে। মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৪.৫ কোটি	...
আইসিটি খাতে রপ্তানি	১৪০ কোটি মার্কিন ডলার	...
তৈরি পোশাক রপ্তানি	বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, চীন প্রথম	...
রপ্তানি আয়	৫২.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০২১-২২ অর্থবছর)	১০.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
স্বাক্ষরতার হার	৭৬ শতাংশ	৫৩.৫০ শতাংশ
খাদ্য সহায়তা	৫০ লাখ পরিবারকে ১৫ টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি চাল, ১ কোটি পরিবারকে টিসিবি কার্ডের মাধ্যমে ৩০ টাকা কেজি দরে চাল ও সাশ্রয়ী মূলে ভোজ্য তেল, ডাল ও চিনি ক্রয়ের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।	কোন উদ্যোগ ছিল না
শিক্ষা বৃত্তি	২ কোটি ৫৩ লক্ষ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি/উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।	...
ফ্রিল্যান্সিংয়ে পেশাজীবীর সংখ্যা	৬ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি	...
ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন	৮ হাজার ৮১২টি	...
ডিজিটাল সেন্টারে মোট সেবার সংখ্যা	৩৫৯টি	

স্বপ্নের পদ্মাসেতু

নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মেট্রোরেল

মধুমতী সেতু

উদ্বোধনের অপেক্ষায়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

নির্মানাধীন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন

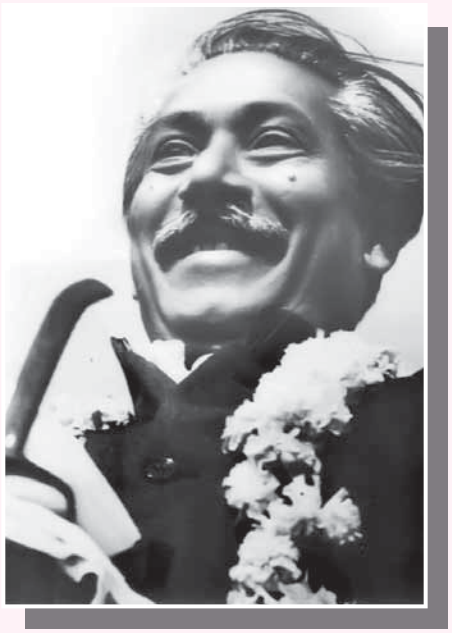

দশই জানুয়ারি: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাঙালির স্বরাজ অর্জনের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। ১৭৫৭ এবং ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বা সিপাহী বিদ্রোহ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম, আন্দোলন, লড়াই এবং আত্মত্যাগ ও বাঙালি জনপদের আলাদা ভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও আন্দোলনে বিলেতের রানির মসনদ কাঁপিয়ে তোলে। এক সময় বাংলা-বিহার ও পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় আবিষ্কৃত হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ফর্মুলা। ভারত ডোমিনিয়ন ভেঙে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান আর ভারত।

আমাদের বাংলার এ অংশ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয় উপনিবেশ হিসেবে। পাকিস্তানিরা জাঁকিয়ে বসে বাঙালির ঘাড়ের ওপর। তারা শোষণ-নির্যাতন শুরু করে। এ অংশের মানুষের সহায়-সম্পদ লুটে পশ্চিম পাকিস্তান গড়ে তোলে। পাকিস্তান স্বাধীনতার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়। তারা প্রথমেই বাঙালির মাতৃজবানের ওপর আক্রমণ চালায় উর্দু প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ এই পাকিস্তানের অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রথম বাঙালি জেগে ওঠে কলকাতা ফেরত যুবক শেখ মুজিবুর রহমান ও তমদ্দুন মজলিশের আবুল কাসেমের নেতৃত্বে। মহান ভাষা আন্দোলনের সেই প্রথম স্ফুরণ ও উন্মেষ পর্ব। একুশ উদ্‌যাপনে উন্মেষ পর্বের কথা কমই বলা হয়েছে ৭০ বছরে।

১৯৪৮ সালের ১৪ই জুলাই ঢাকার বুকে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে– যা বাঙালি হত্যার প্রথম নিদর্শন। ঐ বছর পূর্ব বাংলার মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার লক্ষ্যে আইয়ুব খান নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পুলিশ হত্যাকারী এই আইয়ুব খান হলেন পরবর্তীকালের পাকিস্তানি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। এই ব্যক্তি ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন বর্তমান বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজে আস্তানা গাড়েন।

ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ পর্বের পরপরই সদ্য স্বাধীন পূর্ব বাংলায় বাঙালি পুলিশবাহিনী বঞ্চিত হয়ে সরকারের কাছে কিছু দাবিদাওয়া জানায়। তখন পুলিশের সদর দপ্তর ও থানা ছিল ঢাকার লালবাগের মোগলি দুর্গে। এক পর্যায়ে ঢাকায় অবস্থানরত পুলিশেরা মিছিল সহকারে দুর্গ অবরোধ করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ঐ মিছিলের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্বে দেন সেই সংগ্রামী যুবক মুজিব। অবরোধের এক পর্যায়ে ঘটে নির্মম হত্যাযজ্ঞ। আইয়ুব ও তার বাহিনীর সদস্যদের গুলিতে ২০০ জন বাঙালি পুলিশ নিহত হন। অনেকে বুড়িগঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে প্রাণ দেন।

এরপর ১৯৫২'র মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬'র ছয় দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালির বিপুল বিজয়, ১৯৭১-এ পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বাঙালির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের গড়িমসি, শেষমেশ পাকিস্তানিদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা, যার নির্দেশনা ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দিয়েছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত সিংহপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সামান্য ক্ষণের মধ্যে তিনি বন্দি হন পাকিস্তানি সৈন্যের হাতে এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানি সেনানিবাসে। আবার ২৫শে মার্চ থেকেই সমগ্র বাংলায় শুরু হয় বাঙালি নিধন গণহত্যা।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই জাতীয় সংসদের পূর্ব বাংলার এমপিএ ও এমসিএগণ আগরতলায় মিলিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তৈরি করে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেন।

এই সরকারই কুষ্টিয়ার মেহেরপুরস্থ ভবেরপাড়ার বৈদ্যনাথতলায় আনুষ্ঠানিক শপথ নেয়। মেহেরপুরের নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। এই সরকারকে মুজিবনগর সরকার বলা হয়। যেহেতু সরকার পরিচালিত হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গস্থ কলকাতার থিয়েটার রোডে, তাই এই সরকার প্রবাসী সরকার নামেও অভিহিত হয়। এই সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি থাকায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি) ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হলেন ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান প্রমুখ। এই সরকারই সামরিক বাহিনী গঠন করে নাম দেয় সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানি সৈন্য অধিকৃত বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে প্রথমে গেরিলা আক্রমণ, পরে সরাসরি যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাস্ত করি। তারা আমাদের ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ৯০ হাজার সৈন্যসামন্তসহ এদেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে ঢাকার রেসকোর্সের যেখানটায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানটায় আত্মসমর্পণ করে। আমাদের স্বাধীনতার মূল অংশীদার ছিল ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই যুদ্ধে বাঙালি ত্রিশ লক্ষ প্রাণের সঙ্গে ভারতীয় ২০ হাজার সৈন্য প্রাণ হারান।

একাত্তরের ২৬শে মার্চ থেকে বাহাত্তরের ৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি ছিলেন। আগস্ট মাসে পাকিস্তানি জান্তা ইয়াহিয়া তাঁর বিরুদ্ধে তথাকথিত মামলা ঠুকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেয় এবং তা কার্যকর করার জন্য মিয়ানওয়ালি জেলের বাইরে রাখেন। এই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী একাত্তরের মিত্রমাতা শ্রীমতী

ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বে ঝটিকা সফর, পাকিস্তানিদের ওপর চাপ সৃষ্টি, জাতিসংঘে রাশিয়ার মাধ্যমে ভেটো প্রয়োগ এবং বাংলাদেশের যুদ্ধে সৈন্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সহযোগিতা করেন। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৬ই ডিসেম্বরের পরে পাকিস্তানের ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়। নরহত্যাকারী নরাধম ইয়াহিয়া বিদায় নিলে ভুট্টো ক্ষমতায় আসীন হয়। এখন নতুন বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। আর পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের তাবেদাররা আমাদের হাতে বন্দি, যার সংখ্যা লাখের কাছাকাছি। সবদিক বিবেচনা করে এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়ে ভুট্টো ৮ই জানুয়ারির আগে দুই বার এবং ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেবার এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেনদরবার চালায় বাংলাদেশের সঙ্গে একটি কনফেডারেশন করার। বঙ্গবন্ধু তা নাকচ করে অবিলম্বে বাংলাদেশে ফেরার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন এবং ঐদিনই বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছে অনুযায়ী পিআইএ-এর একটি বিশেষ বিমানে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে পাঠিয়ে দেন। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রধানমন্ত্রী ও রানি অভিনন্দন জানান। আর সংবর্ধনা সভায় তিনি ভাষণ দেন, সাক্ষাৎকার দেন বেতারে। দশই জানুয়ারি তিনি দিল্লি হয়ে বাংলাদেশে বীরের মতো প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে রাজকীয় সম্মান দেওয়া হয়। পালাম বিমানবন্দরে ছুটে আসেন ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁরা বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান। অভ্যর্থনার জবাবে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন,

> আমার জন্য এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশে যাবার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রা বিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী– যিনি কেবল মানুষের নন, মানবতারও নেতা। তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশার অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমাদের দেশের মানুষেরা শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল, তখন তারা কেঁদেছিল, আমাকে যখন বন্দি করে রাখা হয়েছে, তখন তারা যুদ্ধ করেছিল আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে, তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি– আমার হৃদয়ে কারও জন্য কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভর বিজয় হয়েছে। জয় বাংলা, জয় হিন্দ।

এরপর বঙ্গবন্ধুর ঢাকায় পদার্পণ, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। বাংলাদেশ বেতার, আকাশবাণী ও বিবিসি আগেই প্রচার করেছিল বঙ্গবন্ধু ১০ তারিখে ঢাকা ফিরবেন এবং সরাসরি তাঁর প্রিয় স্থান রমনা রেসকোর্স ময়দানে একাত্তরের বিজয়ী সর্বস্তরের বাঙালি জনগণকে সালাম জানাবেন। খবর শুনে যথাসময়ে তেজগাঁও বিমানবন্দরে ছুটে গেলেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা শেখ লুৎফর রহমান, শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানের কাণ্ডারি ও সহচরবৃন্দ। ঢাকা সেদিন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। বেতারে সেদিন সরাসরি ধারাভাষ্য দিলেন শব্দসৈনিক কামাল লোহানী। সে এক ঐতিহাসিক দৃশ্য। বিমানবন্দরে নেমে বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীনকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছিলেন। রমনায়ও তাই, নৌকা শোভিত মঞ্চে উঠে জনতার উদ্দেশে হাত উঠিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি। এখানেও সেই বিমানবন্দরের প্রতিচ্ছবি।

বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জল চোখে নিয়ে তিনি বললেন,

> আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই বীর শহিদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।
>
> ইয়াহিয়া খানের কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র

সন্দেহ ছিল না, তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনার অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নিচু করব না। ...

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।

এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তারা আমাকে হত্যা করবে'। এই হত্যার জন্যই সাজানো মামলায় তাঁকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। এই মামলা, দণ্ডাদেশ এবং বিচারের সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা জানতে পারি বিবিসিতে প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর একটি সাক্ষাৎকারে। এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট।

এরপর বঙ্গবন্ধুর সাধের বাংলাদেশকে গড়ার পালা। প্রথমেই তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বদলে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার কাঠামোর পরিবর্তন করলেন, অতঃপর–

- মিত্রসৈন্যদের স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন
- ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করলেন
- জাতিসংঘসহ তাবৎ বিশ্বের স্বীকৃতি আদায়ে তৎপর হলেন
- সংবিধান তৈরি করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন
- ভারত, রাশিয়ায় গিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন
- ১৫ই জানুয়ারি রেসকোর্সের নাম রাখলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
- সামরিক একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করলেন
- জাতীয় শহিদমিনার নির্মাণ করলেন
- বিদ্রোহী কবিকে ঢাকা আনলেন
- মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের ত্রাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রদান করলেন
- সামুদ্রিক বন্দরে পাকিস্তানিদের বসানো মাইন অপসারণ করলেন রাশিয়ার মাধ্যমে
- মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত মা-বোনদের পুনর্বাসন করলেন

এছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত বিরান ভূমির মাটিতে নিয়ে এলেন শরণার্থীদের এবং তাদের টেস্টরিলিফ, গৃহনির্মাণ এবং শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

আমরা তো বলতেই পারি– তাঁর স্বদেশ ফেরায় এবং ত্বরিতগতিতে এসব কর্মকাণ্ড সমাপ্তি হওয়ায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের ভিত মজবুত হয়েছিল। যারা সেসময় বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিল এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে হিংসার বশে অপপ্রচার চালিয়েছিল, তাদের মুখে চুনকালি লেপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। মূলত এরা ছিল আমাদের একাত্তরের ঘোর শত্রু। তারা আমাদের চিহ্নিত শত্রু। আজও তারা বাংলাদেশ নিয়ে মশকরা করে।

আমাদের অন্যান্য জাতীয় দিবসগুলোর মতো দশই জানুয়ারি একটি আবেগমথিত ও অস্তিত্বরক্ষার দিন। ঐদিনই বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহান বিজয়ের পূর্ণতা পায়।

ইতোমধ্যে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছি। পালন করেছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ। আজ আমরা তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় সুখী জীবনযাপন করছি। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। যার হাল ধরে আছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। তবুও বলতে হয়, এক শ্রেণির মানুষ আমাদের সুখী জীবন বিনষ্ট করতে চায়। ষড়যন্ত্র করতে কূটকৌশল আটে। এদের সম্পর্কে আমাদের একাত্তরের মতো লড়তে হবে এবং সজাগ থাকতে হবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

খালেক বিন জয়েনউদদীন : লেখক, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

'গ্লোবাল এম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস' উপাধি পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রথম 'গ্লোবাল এম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস' হিসেবে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ)। ৫ই ডিসেম্বর ২০২২ পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ডায়াবেটিস সম্মেলন ২০২২-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারিক আহসান ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক আকতার হোসেনের কাছ থেকে সম্মাননা পত্রটি গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক ভিডিও বার্তা অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়।

ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপনকারীদের জীবনমান উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ ব্যক্তিকে 'গ্লোবাল এম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস'-এর সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী দুই বছর 'গ্লোবাল এম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপনকারী মানুষের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রতিবেদন: দেব কুমার

সমন্বিত উন্নয়নের বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

১৯৭১ সালের পূর্বে ঐতিহাসিক কালের কোনো পর্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। অখণ্ডনীয় নিয়তির মতোই বাংলাদেশ পরাধীনতা মেনে নিয়েছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর কাছে। কিন্তু শাসকশ্রেণির শাসন-শোষণ ও নিপীড়নকে বাঙালি যে চিরকাল মেনে নিয়েছে তাও নয়। বরং বিভিন্ন সময় শাসকশ্রেণির অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষ; সংগঠিত হয়েছে ছোটো-বড়ো অসংখ্য বিপ্লব-বিদ্রোহে। আর আত্মাহুতি দিয়েছেন জানা-অজানা অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সৈয়দ শামসুল হক 'আমার পরিচয়' কবিতায় আমাদের জাতিগত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগ্রামের হাজার বছরের যে পথপরিক্রমা নির্মাণ করেছেন সেখানে স্বাধিকারের এই বোধ বিস্ময়কর শক্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন:

> আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে।
> আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
> এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে।
> শুধাও আমাকে 'এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে?'
> তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজমন্ত্রটি শোনো নাই–
> 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
> একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজো একসাথে থাকবোই–
> সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।

এই জীবনবোধ থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন তা আর তিনি বাস্তবায়িত করে যেতে পারেননি। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি স্বাধীনতার মাত্র তিন বছর পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্বজন ও সহকর্মীদের হত্যা করে স্বাধীনতার শত্রুরা ক্ষমতা আরোহণ করে এবং স্বাধীনতার সোনার হরিণ চলে যায় হায়েনাদের দখলে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পক্ষে লড়াই করেছে। নির্বিচারে হত্যা করেছে এদেশের নিরীহ মানুষ। সম্ভ্রম বিনষ্ট করেছে মা-বোনদের। পুড়িয়ে দিয়েছে হাটবাজার, গ্রামগঞ্জ, স্কুল-কলেজ। একটি জটিল প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানুষকে স্বাধীনতার অহংকার, বিজয়ের অহংকার থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারপরিজন এবং আত্মীয়স্বজন ও সহকর্মীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এই পরাজিত শক্তি স্বাধীনতার সকল অর্জনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা যেমন ইতিহাসের নামে নির্লজ্জ মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল, তেমনি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের এই পরাজিত অপশক্তি মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের অর্জন এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করার কৌশল অবলম্বন করে। কিছু সময়ের জন্য তারা সফলও হয়। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্নকে তারা পরিণত করে দুঃস্বপ্নে। গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তারা প্রতিষ্ঠা করে একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরশাসন। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোকে তারা দুষ্প্রাপ্য করে তোলে এবং এর সঙ্গে পাকিস্তানি ভাবাদর্শকে একটি গোপন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করে দেয়। স্বাধীনতার সুফল আর পৌঁছায় না সাধারণ মানুষের কাছে এবং এইভাবে তারা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে, 'বোঝ স্বাধীনতার মজা'। বিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত এই বিভ্রান্তির মধ্যেই দিনাতিপাত করতে হয়েছে এদেশের মুক্তিকামী মানুষকে। এমনকি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় এসেও খুব বেশি পরিবর্তন আনতে পারেনি কিছু মানুষের মনস্তাত্ত্বিক এই উপনিবেশ। কিন্তু তবুও বলা যায়, ১৯৯৬ সালের পর থেকে শুরু হয় বাহাত্তরের সংবিধানের শুভযাত্রা। অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলতে থাকে। মানুষের মনোজগতে পাকিস্তানপ্রীতির যে উপনিবেশ তৈরি করা হয়েছে ১৯৭৫-এর পর থেকে, সেখানেও আসতে থাকে পরিবর্তন। মানুষ অনুভব করতে পারে যে একটি বিভ্রান্তির মধ্যে, মানসিক পরাধীনতার মধ্যে রাখা হয়েছে তাদের। আর এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ধর্ম ও দারিদ্র্যকে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারকে। মানুষকে বোঝানো হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা মুসলমান। তারা আমাদের ভাই। তাদের বিতাড়িত করে বিধর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অন্যায়, অধর্ম। এভাবে ধর্ম, ভারত বিদ্বেষ ও দারিদ্র্যের ত্রয়ী বিভ্রমের মধ্যে রাখার কৌশল নিয়েছিল স্বৈরশাসকগুলো। এর জন্য তারা ব্যবহার করেছে শ্রেণিভিত্তিক পাঠসামগ্রী (content), পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ (context), প্রচারমাধ্যম, ধর্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক। কিন্তু সত্য বড়োই নির্মম। সত্য তার আপন শক্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে বিকশিত হয়-ই একদিন। বাংলাদেশেও তাই হয়েছে। গণজাগরণে আমরা তাই দেখেছি। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছি বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচার হয়েছে যা খুনিরা স্বপ্নেও ভাবেনি। কেননা সাংবিধানিকভাবে এই সব খুনিদের বিচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা আরও বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছি স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা যুদ্ধাপরাধ করেছে, মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে তাদেরও বিচার হচ্ছে একে একে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর যে হন্তারকরা তিলে তিলে মহিরুহ হয়ে উঠেছিল; মন্ত্রী, এমপি আর বিপুল অর্থ-ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে যারা স্বাধীনতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে তাদের বিচার হচ্ছে। কোনো অপরাধীই বিচারের ঊর্ধ্বে নয়– এই সুবচন যে শুধু কথার কথা নয়, এদেশের মানুষ এখন তা উপলব্ধি করছেন। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে, সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে।

২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) নির্ধারিত হয়েছিল জাতিসংঘে। ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত আটটি লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলো।

লক্ষ্যগুলো হলো

১. ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নির্মূল
২. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন
৩. লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
৪. শিশুমৃত্যু হ্রাস
৫. মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন
৬. HIV/AIDS, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
৭. পরিবেশগত ভারসাম্য অটুট রাখা এবং

৮. উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা।

২০১৫ সালের মধ্যে এই আটটি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। *Dhaka Tribune* পত্রিকায় John Hendra যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার শিরোনাম হলো– 'What Bangladesh can teach the world'। শিরোনাম দেখে মনে হতে পারে যে, লেখাটি আবেগ-তাড়িত। কিন্তু যারা লেখাটি পড়েছেন তারা জানেন যে, তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে কীভাবে তিনি একটি দেশের বিস্ময়কর সব অর্জনকে নিষ্ঠা, সততা ও বাস্তবতার নিরিখে উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধের যে অংশটুকু মোটা অক্ষরে লক্ষণীয় করে তোলা হয়েছে তা হলো:

> Despite slower economic growth, Bangladesh has achieved more rapid progress in human development than its neighbours India and Pakistan. Gender equality is a key factor in its success. The Bangladesh experience shows that gender equality is also key for the new development agenda.

বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর উন্নয়নের রহস্য কী? কোন শক্তিতে ও প্রেরণায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি নির্দেশিকায় বাংলাদেশ অতিক্রম করে গিয়েছে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও একাত্তরের পরাজিত অপশক্তি পাকিস্তানকে? এই শক্তি ও প্রেরণার মূলে আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার শক্তি ও বিজয়ের উল্লাস। চিত্ত যেখানে ভয়শূন্য সেখানে নারীশিক্ষা, নারীর কর্মসংস্থান, নারীস্বাস্থ্য ও উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ থাকে অবারিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষশক্তি দেশময় এমন এক পরিমণ্ডল তৈরি করেছে যেখানে নারীসমাজ তার আপন শক্তি-সামর্থ্য ও সৃজনশীলতা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারছে। নারীশিক্ষা, নারীস্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তা তুলনারহিত। এমন এক অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ এই প্রেরণার মূলে নিহিত আছে যার গোপন ন্যায়সূত্র এর জাতিগত ঐতিহ্যের হাজার বছরের ইতিহাস খুঁজলে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, অগ্রগতির এই পরিমাণগত তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করি না। ইউএনডিপি-এর 'মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৫'-তে বাংলাদেশের বিস্ময়কর অগ্রগতির সকল উপাত্ত দেওয়া আছে। তবে যাদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি এখনও মায়াকান্না আছে তাদের জন্য উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্রটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এ প্রসঙ্গে ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে *দৈনিক সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'সব সূচকে পিছিয়ে পাকিস্তান'। সংবাদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানি নাগপাশ থেকে মুক্ত বাংলাদেশ এখন আর্থ-সামাজিক সব সূচকে ওই দেশটিকে ছাড়িয়ে গেছে। গত ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সূচকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে– স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয় ও সম্পদ সংস্থান, সামাজিক বৈষম্যনিরোধ, লিঙ্গসমতা, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান, জননিরাপত্তা, জনমিতি প্রভৃতি সূচকে বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে পাকিস্তান। সার্বিক মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৪২তম। অন্যদিকে পাকিস্তান পাঁচ ধাপ পিছিয়ে ১৪৭তম। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব বাংলা দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তানের অংশ হলেও পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই ভাষা ও সাংস্কৃতিক অমিল স্পষ্ট হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বঞ্চনা। তৎকালীন পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সে (পিআইডিই) কর্মরত ছিলেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি *সমকালকে* বলেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। এর কারণ পাকিস্তানের পূর্বাংশে শিল্প ও বিনিয়োগ করা হতো না। বরং এখানে উৎপাদিত পাট বিক্রি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। এ ছাড়া কৃষকের কাছ থেকে সস্তায় পাট কিনে রফতানিবিষয়ক সুযোগ-সুবিধাও গ্রহণ করত পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরা। এখানে যে কয়েকটি শিল্প-কারখানা ছিল, তার প্রায় সবকয়টির মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ী। এসবের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে। দেখা যাচ্ছে, মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে ১৯৯০ সালেও পাকিস্তান বাংলাদেশের তুলনায় এগিয়ে ছিল। ২০০৪ সালে পাকিস্তানকে অতিক্রম করে বাংলাদেশ। ২০১৪ সালের হিসাবে বাংলাদেশের পয়েন্ট শূন্য দশমিক ৫৭, অন্যদিকে পাকিস্তানের পয়েন্ট শূন্য দশমিক ৫৩। দেখা যাচ্ছে, জাতিসংঘের এই হিসাব মতে, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭১ দশমিক ৬ বছর; অন্যদিকে পাকিস্তানের মানুষের গড় আয়ু ৬৬ দশমিক ২। পাকিস্তানে নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৯; অন্যদিকে বাংলাদেশে নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে পাকিস্তানের অর্ধেকেরও কম, ৩৩ দশমিক ২। স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশ যেখানে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির ৩ দশমিক ৭ শতাংশ ব্যয় করে, পাকিস্তানের ব্যয় সেখানে ২ দশমিক ৭। শিক্ষাক্ষেত্রেও বড়ো ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছে বাংলাদেশে, পিছিয়েছে পাকিস্তান। প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার বাংলাদেশে ৫৮ দশমিক ৮; অন্যদিকে পাকিস্তানে ৫৪ দশমিক ৭।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তানের তুলনায়। ২০১৪ সালের তথ্যের ভিত্তিতে এ বছর এপ্রিলে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। অন্যদিকে একই সময়ে পাকিস্তানের গড় প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

অস্থিতিশীলতা যেখানে পাকিস্তানে ১ দশমিক ৯৫ শতাংশ; বাংলাদেশে সেখানে শূন্য দশমিক ৫৭ শতাংশ। বিনিয়োগ পরিস্থিতিতেও পাকিস্তানের তুলনায় ক্রমোন্নতি লাভ করেছে বাংলাদেশ। ওই প্রতিবেদনেই দেখা গেছে, ১৯৭৬ সালে যেখানে বাংলাদেশে বিনিয়োগ-জিডিপি হার ছিল ১০ শতাংশ সেখানে পাকিস্তানের হার ছিল ১৭ শতাংশ। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ শতাংশে; অন্যদিকে পাকিস্তানে কমে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে। বাংলাদেশের চরম বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হার ২১ শতাংশ; অন্যদিকে পাকিস্তানে এই হার ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ। কর্মসংস্থানেও বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। ১৫ বছরের বেশি বয়সি জনসংখ্যার ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ আয় করে থাকে; পাকিস্তানে এই হার ৫১ দশমিক ৬। চলতি বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি; পাকিস্তানের রিজার্ভ ১৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি। লিঙ্গ সমতায় বাংলাদেশের অর্জন শূন্য দশমিক ৯১৭ পয়েন্ট; পাকিস্তানের অর্জন সেখানে শূন্য দশমিক ৭২৬। জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ মানুষের মধ্যে ২ দশমিক ২ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়; পাকিস্তানে এই হার ৭ দশমিক ৭। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেও এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ২০১০-১৫ সালে বাংলাদেশে এই হার ১ দশমিক ২; অন্যদিকে পাকিস্তানে ২ দশমিক ১১। [...] বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘন ঘন হানা দেওয়া সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে থাকে বাংলাদেশ। অন্যদিকে উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পাকিস্তান আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচক তারই প্রমাণ।

সুতরাং যাদের মধ্যে পাকিস্তানপ্রীতি এখনও প্রবল এবং যেসব মাতৃহন্তারকরা এখনও পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতার অর্জন যাদের চোখে পড়ে না কখনোই, তারা ইউএনডিপি-এর বাংলাদেশের উন্নয়ন সূচক ২০১৫ দেখে নিতে পারে। দেখে নিতে পারে যে, সাধের পাকিস্তানের অবস্থা কতটা শোচনীয় এবং কতটা অকার্যকর হয়ে পড়েছে দেশটি।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ছিল এদেশের মানুষের নিত্যসহচর। ষাটের দশকে যখন মাত্র সাড়ে ছয় কোটি মানুষ বসবাস করত এদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইল আয়তনের ক্ষুদ্র দেশে, তখনও অধিকাংশ মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে জীবনযাপন করতেন। অশিক্ষা-দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্যের এক চরম অবস্থানে ছিল মানুষের নিত্যদিন বেঁচে থাকা। কিন্তু ২০১৬ সালের শুরুতে যখন সেই একই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে প্রায় ষোলো কোটি লোক বসবাস করে, যখন বাড়িঘর, হাটবাজার, রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ নির্মাণ হতে হতে জমি কমে গিয়েছে লক্ষণীয়ভাবে, তখন সেই দেশের মানুষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এমনকি উদ্বৃত্ত। দেশের কোথাও এখন একজন মানুষ অর্ধাহারে থাকে না। অনাহারে থাকার তো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি উত্তরাঞ্চলের যে মানুষ মঙ্গা কবলিত হয়ে বছরের বিশেষ একটি সময়ে চরম খাদ্যাভাবের মধ্যে পড়ত, সেখানেও খাদ্যাভাবের চিহ্নমাত্র নেই এখন। আমাদের কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীগণ কৃষি ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধন করেছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে, শিক্ষায় বিনিয়োগ হলো সর্বোত্তম বিনিয়োগ। স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পরে মানুষ এই সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করার সামর্থ্য অর্জন করেছে। এখন প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার নিরানব্বই ভাগ। ঝড়ে পড়ার হার কমেছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে। শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিক শিক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এরসঙ্গে বেসরকারি সংস্থাগুলোও (এনজিও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির পেছনে সরকারের নানামুখী উদ্যোগের সঙ্গে ১লা জানুয়ারি সকল শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার পর্বত সমান কাজটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার এই মৌলিক জায়গাটিতে নারীশিক্ষার বিষয়টি দেশীয় ও বৈশ্বিক পটভূমিতে সরকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের পন্থায় নারীশিক্ষাকে বেগবান করে তুলতে চেষ্টা করে। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারীশিক্ষাকে অবৈতনিক এবং গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত দরিদ্র মেয়েদের জন্য স্টাইপেন-এর ব্যবস্থা, এছাড়া মেয়েদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিশ্চিত করার জন্য জীবন-দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষার পরিবেশ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা মেয়েদের জন্য উপযোগী করে সাজানো হয়। বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিত করে নারীশিক্ষাকে কার্যকরী ও উৎপাদনশীল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার বিচিত্র কর্মপন্থা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আর সেই কর্মপন্থা ও প্রকল্পগুলো কেন্দ্র থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকার পর্যন্ত সর্বত্রই সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশ নারীশিক্ষায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অর্জন লিঙ্গ সমতা সৃষ্টিতে, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে, মাতৃমৃত্যুর হ্রাসে এবং সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়নে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশ এই সূচকগুলোতে যে অর্জন লাভ করেছে তা বিশ্বের মানব উন্নয়ন গবেষকদের বিস্মিত করেছে। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার বদৌলতে মাতৃস্বাস্থ্য তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করেছে। পাঁচ বছরের চেয়ে কম বয়সি শিশুদের মৃত্যু হারও এমডিজির লক্ষ্যমাত্রার সূচক থেকেও কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি প্রায় প্রতিটি জাতীয় উন্নয়ন কর্মে নারী অসাধারণ সামর্থ্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে পুনরুৎপাদনশীল ও একরৈখিক কর্মজগৎ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের নারীসমাজ উৎপাদনশীল বহু বিচিত্র কর্মের জগতে আত্মনিয়োগ করছে। ফলে নারীদের মধ্যে আর্থিক নিশ্চয়তাবোধ, সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এহসানুল

ইয়াসিন সম্পাদিত *বঙ্গ-সংস্কৃতি উৎসব* গ্রন্থে 'বাঙ্গালির নারীশিক্ষার সংস্কৃতি' প্রবন্ধে আমি লিখেছি:

> আর্থিক সামর্থ্য মানুষের অবস্থা নির্ধারণ করে। মানুষের এই অবস্থা একান্তই বৈষয়িক। এর মাধ্যমে মানুষ ক্ষুদ্র একটি জায়গায় অনিশ্চিত কিছু ক্ষমতা লাভ করে। আর্থিক সামর্থ্য ফুরিয়ে গেলে তার ক্ষমতাও ফুরিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের অবস্থান নির্ধারিত হয় তার শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতার পটভূমিতে। ফলে ব্যক্তির অবস্থানগত ক্ষমতার একটি চিরায়ত স্বরূপ আছে। *জাতীয় শিক্ষনীতি ২০১০*-এ নারীশিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার মূলে আছে আমাদের নারীসমাজকে ধীরে ধীরে এই অবস্থানগত ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা। ফলে পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে শুরু করে সমাজে, রাষ্ট্রে ও বৈশ্বিক ব্যবস্থায় আমাদের নারীসমাজের যে সুসংস্থিত ক্ষমতায়নের পরিধি পরিলক্ষিত হওয়ার কথা ছিল তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
>
> নারীসমাজের টেকসই ক্ষমতায়নে শিক্ষার যে কোনো বিকল্প নেই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষার মাধ্যমে নারীসমাজ মানবসম্পদে পরিণত হতে পারে, মানবীয় মর্যাদা ও সৃষ্টিশীলতা অর্জন করতে পারে, অধিকারের জায়গাগুলো চিনতে পারে, অন্যের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করতে পারে এবং সম্মান করতে শিখে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে *জাতীয় শিক্ষনীতি ২০১০*-এ সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব পটভূমিতে নারীসমাজকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিপুল আয়োজন বাস্তবায়ন চলছে। আশা করা যায় এই প্রক্রিয়ায় নারীশিক্ষার একটি সংস্কৃতি তৈরি হবে এবং অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন সম্ভব হবে।

অর্থাৎ শুধু বৈষয়িক উন্নয়ন নয়, উন্নয়নের চেতনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ একটি সুস্থিরতায় উপনীত হয়েছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেনসহ আরও অনেক অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকগণ এই বলে বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন যে, মানব উন্নয়ন সূচকগুলোতে বাংলাদেশ গত এক দশকে যে অগ্রগতি লাভ করেছে তা ঈর্ষণীয় এবং পৃথিবীর অনেক দেশ এই অগ্রগতি লাভের কৌশলের ক্ষেত্রে শিক্ষা নিতে পারে। স্থানীয় সরকারগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে নারীদের শিক্ষা ও সচেতনতা প্রদান এবং সমাজ উন্নয়ন খাতে ব্যয়ভার বৃদ্ধিতে সরকারের ভূমিকা বিশ্বজুড়ে প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়া পল্লির দারিদ্র্য বিমোচনে দক্ষতা অর্জন ও আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প', ছিন্নমূল মানুষের মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দেওয়ার জন্য 'আশ্রয়ণ প্রকল্প', 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার জন্য সরকারের বিপুল আয়োজন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম, নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম, 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র' স্থাপন এবং যুবসমাজকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি' ইত্যাকার অসংখ্য উন্নয়ন কর্মসূচি দেশের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করে তুলছে। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে আইনি যুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় এবং ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ছিটমহল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সক্ষমতাকে তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চতায় উপনীত করেছে।

এইসব উন্নয়নে সরকার অনুঘটক মাত্র। এর মূল নিয়ামক শক্তি হলো এদেশের সাধারণ মানুষ। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে তারা যে প্রেরণা ও প্রাণশক্তির পরিচয় রেখে চলছেন তা নিঃসন্দেহে আশাজাগানিয়া। সেই আশাবাদী জীবনদর্শনেও বাংলাদেশ পৃথিবীর এক নম্বর দেশ। সুতরাং বাংলাদেশ যে অসাধারণ সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে– তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান: সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, drsharkaramannan@yahoo.com

Rb¨kZe‡I e½eÜz শীর্ষক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ *জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধু* শীর্ষক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে । ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সম্পাদনায় এবং সচিব মো. খলিলুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় ৪৮০ পৃষ্ঠার গবেষণাধর্মী ও তথ্যসমৃদ্ধ এ গ্রন্থটিতে জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্পৃক্ততা তুলে আনা হয়েছে। ২৮শে ডিসেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মো. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন। অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব উল আলম অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার *জন্মশতবর্ষে বঙ্গবন্ধু* শীর্ষক বইটিকে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে অংশগ্রহণের অভিযাত্রায় একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বইটিতে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তাটি মগবাজার টিঅ্যান্ডটি অফিস থেকে সলিমপুরে ট্রান্সফার করার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তিনি বলেন, জাতির পিতার হাত ধরে প্রযুক্তিতে শত বছরেরর পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি আমাদের তৃতীয় শিল্পবিপ্লবে অংশগ্রহণের প্রচেষ্টার সূচনা ছিল। তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে বইটিতে তুলে আনা হয়েছে বাঙালির অগ্রযাত্রার সেই সোপান। জাতীয় জীবনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গুরুত্বের বিষয়টি ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ঐতিহাসিক সম্পৃক্ততা, নীতিনির্ধারণী ও গুরুত্বপূর্ণ দলিলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, মহান মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থার ৫০ বছরের সাফল্য, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থাসমূহ, নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৭টি অধ্যায়ে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংযোজিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: নিলয় হোসেন

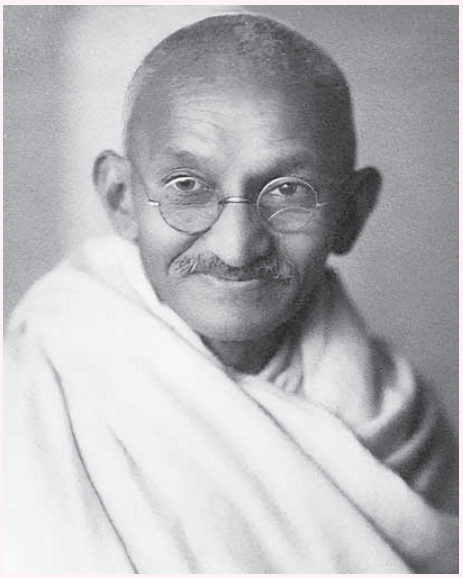

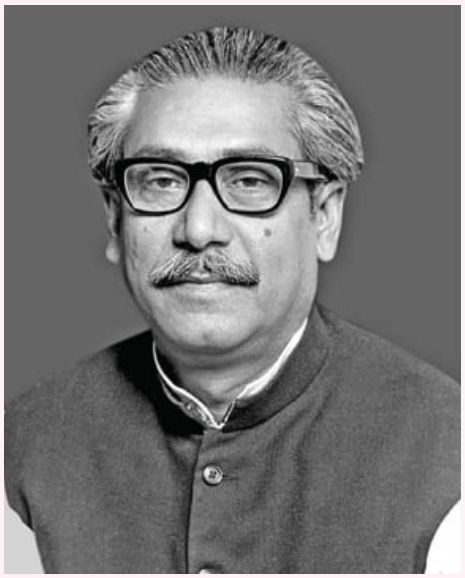

অহিংস ভাবনা

গান্ধী থেকে বঙ্গবন্ধু

রফিক জামান

বিশ্ব থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, অসহিষ্ণুতা ও রক্তপাত বন্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে প্রতিবছর ২রা অক্টোবর বিশ্ব অহিংস দিবস পালন করা হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকাই এ দিবসের মূল কথা।

পৃথিবীর অসহিষ্ণুতা, উত্তেজনা, সহিংসতা বন্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনকে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারতে এদিনটি 'গান্ধী জয়ন্তী' হিসেবেই পরিচিত।

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের গুজরাট প্রদেশের পারবন্দর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী একজন সাধারণ মানুষ অসাধারণ এক আন্দোলনের সূচনা করে বিশ্ববাসীর হৃদয়মন্দিরে স্থান করে নিয়েছিলেন। মানবজাতিকে নৈতিক আহ্বান জানিয়ে মহাত্মা গান্ধী শুদ্ধতম শক্তির পথ দেখিয়েছেন। অসাম্প্রদায়িক মনমানসিকতা, অকৃত্রিম মানবপ্রেম মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রভূষণ ছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অপরাধে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। তিনি বিশ্বাস ও আস্থায় ছিলেন অবিচল। ছিলেন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তিধর একজন মানুষ।

২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্যারিসে ইরানি নোবেল বিজয়ী শিরিন এবাদী তাঁর একজন হিন্দি শিক্ষকের কাছ থেকে দিবসটির ব্যাপারে একটি প্রস্তাবনা গ্রহণ করেন। পরে ২০০৭ সালে সোনিয়া গান্ধী এবং ডেসমন্ট টুটু জাতিসংঘে সিদ্ধান্তটি পেশ করেন। ২০০৭ সালের ১৫ই জুন জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ২রা অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সমাজসংস্কারের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধী একই বিন্দুতে অবস্থান করতেন। উভয়েরই ধ্যানধারণায় ছিল স্বদেশের মুক্তি ও অগ্রগতি। সহজাতভাবে তাঁরা দুজনেই ছিলেন মুক্ত চিন্তা-চেতনার প্রবক্তা এবং স্পষ্টভাষী। ভারতবর্ষের উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর আন্তরিক প্রচেষ্টার দায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন আন্দোলন, প্রতিবাদ কর্মসূচিসহ অনেক বিষয় নিয়েই তাঁরা তর্কবিতর্ক করতেন। এই বিতর্ক ব্যক্তি পর্যায়ে বৈঠক থেকে ভাষণ, চিঠিপত্র ছাড়িয়ে পত্রিকার পাতায় পর্যন্ত হাজির হয়েছে। তর্কবিতর্কে এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব যুক্তি-পালটা যুক্তি দিয়ে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেছেন, তবে সে বিতর্কগুলো ছিল সহনশীল, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সৌজন্যমূলক। মতদ্বৈততা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেন বলেই তাঁরা ছিলেন পরমতসহিষ্ণু। যার ফলে মত ও পথের পার্থক্যেও তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল অটুট। পরমতসহিষ্ণুতা এবং সম্প্রীতির এমন দৃষ্টান্ত উপমহাদেশের ইতিহাসে বিরল।

সব ধর্মেই কমবেশি অহিংসার কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম ছিল মানুষ হিসেবে মানুষকে দেখা নিয়ে। মানবাত্মার মুক্তি নিয়ে। এই মুক্তিকেই তিনি দীর্ঘ জীবনব্যাপী তাঁর সৃজনের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিলেন। আলোয় আলোয় এই আকাশে, ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে, সর্বজনের মনের মাঝে তিনি মুক্তি দেখেছেন, যেখানে কোনো সংকীর্ণতার স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গান ও কবিতায় অহিংসার কথা বলেছেন। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার কথা বলেছেন। অনেক কালজয়ী গানে ও কবিতায় তা স্পষ্টত প্রতীয়মান। তিনি সীমার মধ্যে অসীমকে তুলে আনতে চেয়েছিলেন বলেই ইঙ্গিত করেছেন:

> আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
> দেখতে আমি পাইনি...
> বাহির পানে চোখ মেলেছি...
> আমার হৃদয় পানে চাইনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রকাশ্যে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করেছেন। গান্ধী, মার্টিন লুথার ও ম্যান্ডেলার মতো অহিংসবাদী নেতারা যেভাবে বার বার কারাবরণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অবিস্মরণীয় নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামের প্রধান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁদের আন্দোলন ও সংগ্রামে গান্ধীর আদর্শিক প্রেরণার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতর ছয় দফার মাধ্যমে স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের ধারণা জনপ্রিয় করেছেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। গান্ধীর অহিংস-

অসহযোগ আন্দোলন বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের প্রাক্কালে নতুন মাত্রা ও ব্যাপ্তি প্রদান করেছিল, যা বাংলাদেশে পাকিস্তানের ২৩ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ অচল করে দিয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই মহান নেতা বিশ্বে শান্তি ও মানবতার বার্তা প্রচারে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিজীবনে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। জিন্নাহর ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা ও প্রতারণা তিনি সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির এক বছরের ভেতরই উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-এর লেখা এর বড়ো প্রমাণ। বঙ্গবন্ধু গোপনে গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা, বাঘা যতীন এবং সর্বোপরি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে। নেতাজীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর অনুরাগের কথা তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে রয়েছে। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধু যে নীতি ও কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সেখানে তাঁর পূর্বসূরি দুই নেতা গান্ধী ও সুভাষ বসুর মিলিত প্রভাব হয়ত ছিল, তবে তিনি এই দুই নেতার শান্তি ও সংগ্রামের রণনীতি নিজের মতো করে গ্রহণ করেছিলেন।

গান্ধীজীর জীবনে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পুরোপুরি সফল না হলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার মাটিতে সফল হয়েছিলেন। শান্তিপূর্ণ উপায় শুধুমাত্র অহিংস ও অসহযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব– তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রয়োজন আছে, তবে শান্তির জন্য প্রয়োজন হলে অস্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে। হিংস্রতাকে অস্ত্র দিয়ে দমন করতে হয়। যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়, তখন হিংস্রতাকে বৃহত্তর হিংস্রতা দিয়েই মোকাবিলা করতে হয়। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে ঘোষণা করেন, যদি এই অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয় তবে জনগণ যেন যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে। তারা যেন সশস্ত্র যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করে। বঙ্গবন্ধু একদিকে সংগ্রামী অন্যদিকে শান্তিকামী ছিলেন। তিনি ঘুরেছেন পূর্ব বাংলার মাঠেঘাটে, চেয়েছেন শোষক শ্রেণি থেকে মুক্তি, ন্যায্যতা আর মানুষে মানুষে সমতা। যাঁর শক্তি ও দুর্বলতা, দুটোই ছিল মানুষকে ঘিরে। এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সবচেয়ে বড়ো শক্তি এবং দুর্বলতা বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'My greatest strength is the love of my people and my greatest weakness is that I love them too much.'

সম্ভবত রাজনীতির এ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বঙ্গবন্ধু পেরেছিলেন সমগ্র জাতিকে এক মঞ্চে এক মন্ত্রে দাঁড় করাতে এবং যার মাঝে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ভারতের গান্ধী ও চীনের মাও সেতুংয়ের মতো বঙ্গবন্ধুও চেয়েছেন সকল প্রকার শোষণ ও অবিচার থেকে জনগণের মুক্তি।

বঙ্গবন্ধু শোষণ-পীড়নমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিবেচনা করেছেন বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত হিসেবে। মহাত্মা গান্ধী ধর্মবিশ্বাস, আত্মশুদ্ধি এবং পরমতসহিষ্ণুতার ভেতর বিশ্বশান্তির নিদান খুঁজেছেন। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ, যাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল জনগণের শক্তিতে, প্রত্যয় ছিল ন্যায্য অধিকার দেওয়ায়।

পথ ভিন্ন হলেও গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু দুজনেই বিশ্বশান্তির আন্দোলনে সব সময় উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন, যুগ যুগ ধরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে চলার প্রেরণা জোগাবেন।

রফিক জামান: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৫১তম বিজয় উৎসব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৫১তম বিজয় উৎসব ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড বরাবরের মতো যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। এ উপলক্ষে সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড চার দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ৬ই ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দফতরে সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল ডিএস কুশওয়া এক সংবাদ সম্মেলনে বিজয় উৎসবের কর্মসূচি তুলে ধরেন। এতে বলা হয়, এবার কলকাতায় আয়োজিত সেনাবাহিনীর বিজয় উৎসবে বাংলাদেশ থেকে যোগ দেন ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। যোগ দেন ছয়জন উচ্চপদস্থ সেনা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাও। এ বিজয় উৎসব চলে ১৩-১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের বীরদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরদিন ফোর্ট উইলিয়ামের শহিদ স্মারকে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও কুচকাওয়াজের মাধ্যমে একাত্তরের বীরদের স্মরণ করা হয়। ঐদিনই সন্ধ্যায় কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আয়োজন করা হয় বিশেষ সাংকৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলো ও ধ্বনির বিশেষ প্রদর্শনী।

প্রতিবেদন: ইশরাত হক

বাংলাদেশের অর্থনীতি

এম এ খালেক

আরও একটি বছর অতিক্রান্ত হলো। এখন আমরা খ্রিষ্টীয় ২০২৩ সালে। নানা কারণেই বিগত বছরটি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ২০১৯ সালে চীনে শুরু হওয়া করোনা অতিমারি বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। করোনা অতিমারির মতো আর কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে এতটা উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারেনি। বাংলাদেশে করোনা অতিমারির প্রাদুর্ভাব শুরু হয় ২০২০ সালের মার্চ মাসে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য খাতে করোনা অতিমারি ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশেষ করে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তবে সরকারের সময়োপযোগী এবং কার্যকর বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে করোনা অতিমারির প্রভাব অনেকটাই সীমিত রাখা সম্ভব হয়। বাংলাদেশেও করোনা অতিমারির প্রভাব ২০২২ সালের শুরুতে কিছুটা কমে আসতে শুরু করে। মানুষ আশায় বুক বেধে অপেক্ষা করছিল। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবারও সচল হয়ে ওঠার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশও নব উদ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখনো কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। করোনার কারণে শিল্পকারখানায় স্বাভাবিক উৎপাদন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও কৃষি খাতের উৎপাদন কার্যক্রমে খুব একটা প্রভাব পড়েনি। কারণ করোনার প্রভাব শহরের মতো গ্রামীণ জনগণকে সেভাবে বিপন্ন করতে পারেনি। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকটাই স্বাভাবিক ছিল। কৃষি খাতকে উপলক্ষ করেই দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছিল। ঠিক সেই সময় রাশিয়া কর্তৃক ইউক্রেনে আক্রমণ করার কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে যায়। বিশ্ব এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়। করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। করোনার প্রভাব কাটানোর পরিবর্তে বিশ্ববাসী নতুন করে মারাত্মক সংকটের মুখোমুখি হয়।

রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার ওপর ব্যাপক সামরিক এবং অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। পালটা ব্যবস্থা হিসেবে রাশিয়া আন্তর্জাতিক বাজার, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে জ্বালানি তেল ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে অথবা কমিয়ে দেয়। ন্যাটো ও রাশিয়ার এই পালটাপালটি অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে বিশ্ব এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে অসহনীয় উচ্চ মাত্রার মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী অর্থনীতিও অসহনীয় মূল্যস্ফীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। এক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির হার ৯ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়। ব্রিটেনের মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ অতিক্রম করে যায়। সার্বিকভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশ অতিক্রম করে যায়। রাশিয়া এবং ইউক্রেন মিলিতভাবে বিশ্বের দানাদার খাদ্যের ৩০ শতাংশ জোগান দিয়ে থাকে। গত মৌসুমে ইউক্রেনে মোট ৮ কোটি ৬০ লাখ টন খাদ্য পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে দেশটি তাদের উৎপাদিত খাদ্য পণ্য স্বাভাবিকভাবে রপ্তানি করতে পারেনি। এমনকি খাদ্য পণ্য বোঝাই জাহাজ দীর্ঘ দিন বন্দরে আটকে ছিল। ইউক্রেনীয় কৃষকরা যুদ্ধের কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ৩০ শতাংশ তুলতে পারেনি। মাঠেই নষ্ট হয়ে গেছে। চলতি মৌসুমে ইউক্রেনীয় কৃষকরা তাদের মাঠে ফসল ফলাতে পারেনি স্বাভাবিক সময়ের মতো। ফলে এ বছর বিশ্বব্যাপী খাদ্য পণ্যের সংকট তীব্রতর হতে পারে। যেসব দেশ আমদানিকৃত খাদ্য পণ্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল তারা খুবই সমস্যায় পতিত হবে। বাংলাদেশ কিছু পরিমাণ গম এবং অন্যান্য খাদ্য পণ্য রাশিয়া এবং ইউক্রেন থেকে আমদানি করে থাকে। যুদ্ধের কারণে আমদানিকৃত গমের মূল্য বেশি দিতে হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের একটি সুবিধা হলো জনগণের খাদ্য চাহিদার একটি বড়ো অংশই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা হচ্ছে। করোনা এবং রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ সত্ত্বেও বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রম অনেকটাই স্বাভাবিক ছিল। সরকার কৃষি খাতে ব্যাপক মাত্রায় ভরতুকি দিচ্ছে। ফলে কৃষক তুলনামূলক কম মূল্যে কৃষি উপকরণ ক্রয় করতে পারছে।

বাংলাদেশ ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য প্রদর্শন করে চলেছে। বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ৯৪তম অবস্থানে থাকলেও চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি.) তথ্য মতে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট ৩ কোটি ৯৭ লাখ টন চাল উৎপাদিত হয়েছে। দেশে বার্ষিক খাদ্য চাহিদার পরিমাণ হচ্ছে ৩ কোটি ৫৫ লাখ টন। অর্থাৎ খাদ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে ৪২ লাখ টন। মুরগির ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ২৯তম। স্বাদু পানির মাছ আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। সবজি উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ২০তম। ১৯৭১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ৯ই জুন ২০২২ জাতীয় সংসদে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনের জন্য অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করছেন– পিআইডি

সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি বিজ্ঞানীরা মোট ১১১টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছেন। ফলে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় এক ধরনের বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য প্রদর্শন করে চলেছে। বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের

ক্ষেত্রে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করেছে। স্বাধীনতার ৫১ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে সোয়া দুই গুণেরও কম। আর চালের উৎপাদন প্রায় ৪ গুণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাধিকবার বলেন, আগামীতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। তাই আমাদের প্রতি ইঞ্চি ফসলি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আবাদযোগ্য এক ইঞ্চি জমিও পতিত ফেলে রাখা যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হচ্ছে কৃষি ও পল্লি ঋণ ব্যবস্থা। কৃষি ও পল্লি ঋণ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলা। গতবছর কৃষি খাতে সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকার ফলে এই খাতে উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়েনি। সরকার নানাভাবে কৃষি যান্ত্রিকায়নের ব্যবস্থা করেন। ফলে কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

করোনার কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের উৎপাদনশীল (শিল্প) খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। করোনার কারণে অনেক দিন পর্যন্ত শিল্পকারখানায় 'লক ডাউন' চলে। এতে উৎপাদন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। করোনার প্রভাব কিছুটা কমে এলে আবারও নতুন করে শিল্পকারখানায় উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দেবার মুহূর্তে শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। যে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য ছিল ব্যারেল প্রতি ৮০ মার্কিন ডলারেরও কম তা এক পর্যায় ১৩৯ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় বাজারেও জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়াতে হয়। এতে শিল্প খাতের উৎপাদন ব্যবস্থা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপরও আমাদের শিল্প খাতের উৎপাদন যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশের শিল্প খাতের উৎপাদন কিছুটা হলেও স্বাভাবিক রাখার কারণে আমাদের রপ্তানি আয় গতবছর রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করতে সমর্থ হয়। সব মিলিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ইতিবাচক। প্রথমবারের মতো ৪টি পণ্য রপ্তানি আয় শত কোটি মার্কিন ডলারের ল্যান্ড মার্ক অতিক্রম করে। এগুলো হচ্ছে– তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্য। নতুন যে পণ্যগুলো শত কোটি মার্কিন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে সেগুলোর সবই স্থানীয় কাঁচামালনির্ভর। সম্পূর্ণ স্থানীয় কাঁচামালনির্ভর বলে তারা জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় শতভাগ মূল্য সংযোজন করে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে ৬০ লাখের মতো। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে উন্নত দেশগুলোতে ভোক্তাদের ব্যয়ের সামর্থ্য এবং প্রবণতা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এতে রপ্তানিকারক দেশগুলো বিপাকে পড়ে। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ অর্ডার হারাতে থাকে। সেই অবস্থায় রপ্তানি বাণিজ্যে ধস নামবে বলে অর্থনীতিবিদগণ আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশেও বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ বেশ সাফল্য প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। গত জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১০ শতাংশ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে মোট রপ্তানি আয় হয়েছিল ২ হাজার ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ২ হাজার ৭৩১ কোটি মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ডিসেম্বর মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ৫৩৭ কোটি মার্কিন ডলার। এটা এ যাবৎকালের মধ্যে এক মাসে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়। রপ্তানি আয়ের এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে অর্থবছর শেষে মোট রপ্তানি আয় ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারে। এটা হবে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এক বিরল রেকর্ড। বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি আয়ের এই ধারা বহাল রাখার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। রপ্তানিকারকদের কাঁচামাল আমদানিতে সুবিধা দেওয়ার জন্য ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক বিশেষ সহায়তা তহবিল গঠন করেছে। রপ্তানি আয় বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানিকারকদের উপার্জিত আয়ের ওপর প্রতি মার্কিন ডলারে স্থানীয় মুদ্রায় এক টাকা বেশি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের পদ্মা সেতু হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে জটিল স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। পদ্মা নদীর মতো খরস্রোতা নদীর ওপর এমন একটি ব্রিজ নির্মাণ করা সহজ কথা নয়। নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সাফল্য নতুন করে প্রতীয়মান হয়েছে। গত জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ২৬ লাখ ৭৩ হাজার ৩৬১টি যানবাহন পদ্মা সেতু দিয়ে পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে ৩৯২ কোটি ৮২ লাখ টাকা। এদিকে বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে একই সময়ে মোট ৩৫ লাখ ৭৮ হাজার ২৪৮টি যানবাহন পারাপার করেছে। টোল আদায় হয়েছে ৩২৭ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

করোনাকালেও বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন কার্যক্রম অনেকটাই গতিশীল ছিল। করোনা সত্ত্বেও নতুন শিল্পে বিনিয়োগ কার্যক্রম ছিল আশাব্যঞ্জক। বর্তমান মুদ্রা নীতিতে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। আগের বছর এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ। সেই বছর অর্জিত হয়েছিল ১১ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কয়েক মাস আগে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ, যা ছিল নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের স্থিতি ছিল ১০ লাখ ০২ হাজার ৯৬৬ কোটি টাকা। ২০২০ সালের জুলাই মাসে এটা ছিল ১০ লাখ ৯৫ হাজার ২০১ কোটি টাকা। ২০২১ সালের জুলাই মাসে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণ স্থিতির পরিমাণ ছিল ১১ লাখ ৮৭ হাজার ১০ কোটি টাকা। আর গত জুলাই মাসে এটা ছিল ১৩ লাখ ৫২ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকা। ব্যাংক ঋণের সুদের সর্বোচ্চ হার ৯ শতাংশে নির্ধারিত থাকায় ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী হচ্ছেন। ব্যাংক ঋণের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি বহমান থাকার কারণে দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে এক ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তাদের সেই গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপক সম্ভাবনার দিকটি ফুটে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি নানা জটিলতা সত্ত্বেও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশকে পেছনে ফেলে দ্রুত বর্ধনশীল দেশ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার এই ধারা বহমান থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি'র আকার হচ্ছে ৪১৬ বিলিয়ন মার্কিন

ডলার। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যা দেশটির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে জিডিপি গঠনের অংশীদারিত্বের বিষয়ে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভোক্তা ব্যয় ব্যাপকভাবে বেড়েছে। জিডিপি গঠনের ক্ষেত্রে ভোক্তা ব্যয়ের অংশীদারিত্ব হচ্ছে ৬৮ দশমিক ৮ শতাংশ। বিনিয়োগ (সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ের) জিডিপি'র ৩১ শতাংশ। সরকারি ব্যয় ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। নিট রপ্তানি ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। জিডিপি'তে খাতভিত্তিক অবদান হচ্ছে কৃষি ১২ শতাংশ, শিল্প ৩৩ শতাংশ ও সেবা খাত ৫১ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি আরও বলেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে নবম বৃহত্তম ভোগ বাজারে পরিণত হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই নভেম্বর ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৫ জেলায় ১০০টি সেতুর উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত। এই খাতের সম্ভাবনা পণ্য রপ্তানি খাতের চেয়েও বেশি। কারণ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে যে আয় হয় তার পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। বর্তমানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে তার মূলে প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে জনশক্তি রপ্তানি খাত। জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে প্রায় সোয়া কোটি বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বৈধ পথে মোট ২ হাজার ১০৩ কোটি মার্কিন ডলার দেশে প্রেরণ করেছে। একটি সংস্থার মতে, প্রবাসী বাংলাদেশিরা গত এক বছরে হুন্ডির মাধ্যমে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সম পরিমাণ অর্থ দেশে প্রেরণ করেছে। গত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ ১৭০ কোটি মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আহরণ করেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৮ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা। এটা আগের বছর ডিসেম্বর মাসের চেয়ে ৭ কোটি মার্কিন ডলার বেশি। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে রেমিটেন্স এসেছিল ১৬৩ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে রেমিটেন্স এসেছে ১ হাজার ৪৯ কোটি ৩২ লাখ মার্কিন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে রেমিটেন্স এসেছিল ১ হাজার ২৩ কোটি ৯৫ লাখ মার্কিন ডলার। সরকার প্রবাসে গমনেচ্ছুক বাংলাদেশিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। আগামীতে বাংলাদেশ দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত জনশক্তি আরও রপ্তানি করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আগামীতে পেশাজীবীদের অধিক হারে বিদেশে প্রেরণের উদ্যোগ নিতে পারে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ২০২২ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে সবচেয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল অস্বাভাবিক মাত্রার উচ্চ মূল্যস্ফীতি। বিশ্ব অর্থনীতি বিগত ৪০ বছরের মধ্যে এমন উচ্চ মূল্যস্ফীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি এটা পূর্বেই বলা হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির এই অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশের অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। বাইরে থেকে আসা কিছু সমস্যা আমাদের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। উচ্চ মাত্রায় মূল্যস্ফীতি তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে মূল্যস্ফীতির হার ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করে। ডিসেম্বর মাসে এসে মূল্যস্ফীতির হার ৮ দশমিক ৭১ শতাংশে নেমে আসে। এর মধ্যে খাদ্য এবং খাদ্য বর্হিভূত মূল্যস্ফীতির হার ছিল যথাক্রমে ৭ দশমিক ৯১ শতাংশ ও ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক অতি প্রয়োজনীয় নয় এমন সব পণ্য আমদানি নানাভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। আগামীতে মূল্যস্ফীতি আরও কমে আসবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

গত বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ অনেকটাই কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দু'ভাবে রিজার্ভ হিসাবায়ন করে থাকে। গ্রস হিসাবায়ন এবং নিট হিসাবায়ন। গ্রস হিসাবায়ন পদ্ধতি বিবেচনায় নিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর নিট পদ্ধতিতে রিজার্ভ হিসাবায়ন করলে মোট রিজার্ভের পরিমাণ হচ্ছে ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বছরের শেষে এসে বিভিন্ন সূত্র থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ বাড়তে থাকায় রিজার্ভ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ রিজার্ভ স্ফীত করা এবং অন্যান্য কাজে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ)-এর নিকট থেকে ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ নিতে যাচ্ছে। আইএমএফ'র পরিচালনা বোর্ডের সভায় বাংলাদেশকে ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণদানের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান বলেন, আইএমএফ'র ঋণ হচ্ছে চরিত্রগত সার্টিফিকেটের মতো। উল্লেখ্য, আইএমএফ যখন কোনো দেশকে ঋণ প্রদান করে তখন বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জাইকা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা সংশ্লিষ্ট দেশকে বিনা প্রশ্নে ঋণ দিয়ে থাকে। কাজেই এই মুহূর্তে আইএমএফ'র ঋণ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গত বছর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আর একটি সংকটের সৃষ্টি করেছিল ব্যাংকিং সেক্টর। ব্যাংকিং সেক্টরে কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। এদিকে একটি মহল পরিকল্পিতভাবে ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। ব্যাংকের মূল পুঁজি হচ্ছে সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস। গুজবের কারণে সাধারণ আমানতকারীদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ আমানতকারীদের আশ্বস্ত করেন। ইতোমধ্যে মানুষের মাঝে আস্থা ফিরে আসায় আমানতকারীরা ব্যাংকমুখো হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেম অত্যন্ত শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেন, এ বছর বিশ্বের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ দেশ মন্দার কবলে পড়তে যাচ্ছে। এই

মন্দার কারণ হতে পারে খাদ্য পণ্যের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি। বাংলাদেশের অর্থনীতি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মন্দার কবলে পতিত হওয়ার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কারণ বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এবং খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রম এখনও স্বাভাবিক রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টরই গতিশীল অবস্থায় রয়েছে।

২০২২ সালে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বপ্নের পদ্মা সেতু এবং মেট্রোরেল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করা হয়েছে। একটি দেশের কার্যকর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। গত ২৮শে ডিসেম্বর মেট্রোরেল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে আমরা বিশ্বে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির মর্যাদা বাড়িয়েছি। আজ আমরা মেট্রোরেল উদ্‌বোধনের মাধ্যমে জনগণের মুকুটে নতুন অহংকারের পালক যুক্ত করলাম। রাজধানীবাসীর চলাচল ব্যবস্থাকে সহজীকরণের উদ্দেশ্যেই চালু করা হয়েছে মেট্রোরেল পরিবহণ ব্যবস্থা। মেট্রোরেল ব্যবস্থা শুধু যে নগরবাসীর চলাচলকে সহজ করবে তা নয়, একইসঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিতে এই পরিবহণ ব্যবস্থা বিপুল পরিমাণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, কূটনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ২৮৫ জন যাত্রী সহযোগে প্রথম মেট্রোরেল ভ্রমণ করেন। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। মেট্রোরেল ব্যবস্থা চালু হওয়ার কারণে সাধারণ নাগরিকদের অর্থ ও সময় উভয়ই বাঁচবে। সাধারণ নাগরিকদের অর্থ সাশ্রয় হবে যার পরিমাণ জিডিপি প্রবৃদ্ধির এক শতাংশের সমান।

কিছুদিনের মধ্যেই কর্ণফুলী নদীর ভেতর দিয়ে নির্মিত টানেল উদ্‌বোধন করা হবে। বর্তমান সরকারের আমলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে।

গত পঞ্জিকা বছরের বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আলাপ হয় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদের সঙ্গে। তিনি বলেন, ২০২২ সাল বিশ্ববাসীর জন্য ছিল অত্যন্ত জটিল একটি বছর। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ কিছু সমস্যা পুরো বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রভাব থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয়। বাংলাদেশও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যার প্রভাবে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বেশ ভালো ছিল। প্রথমত, বাংলাদেশ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। অতিমারি করোনা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। দ্বিতীয়, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো একটি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু নির্মাণকাজে দুর্নীতি হবে এই অভিযোগ উত্থাপন করে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়। সেই অবস্থায় ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। তাঁর এই ঘোষণা অনেকের নিকটই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু সেই পদ্মা সেতু আজ দিনের মতো বাস্তব। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বাইরের দুনিয়ায় একটি বার্তা দিয়েছে যে, বাংলাদেশকে আর অবহেলা করা যাবে না। বাংলাদেশ চাইলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। পদ্মা সেতু দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। পদ্মা নদী কার্যত রাজধানী থেকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আগে ঢাকা থেকে খুলনা যেতে অন্তত ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হতো। এখন মাত্র ৪ ঘণ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করা যাচ্ছে। পদ্মা সেতুর কারণে দেশের জিডিপি'র পরিমাণ এক থেকে এক দশমিক ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। অনেকে অবশ্য বলেন, পদ্মা সেতু জিডিপি'র পরিমাণ ২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোর সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করেছে পদ্মা সেতু। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে শিল্পায়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পদ্মা সেতুর কারণে। ২০২৩ সালে বিশ্ব নানা ধরনের আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভালো করবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদের নিকট ২০২২ সালের সাফল্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশ করোনা মোকাবিলা ও অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার জন্য যে নীতিকৌশল গ্রহণ করে তা প্রশংসনীয়। সরকারের এই বাস্তবসম্মত কৌশলের কারণেই করোনা আমাদের অর্থনীতির তেমন একটা ক্ষতি করতে পারেনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর প্রভাব থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। তারপরও বাংলাদেশ আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সাফল্য প্রদর্শন করে চলেছে তা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২২ সালে মোটামুটি ভালোই ছিল। এ বছরও ভালো কাটবে– এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর সরকার আগামীতে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে।

এম এ খালেক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক, khaleque09@yahoo.com

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মহানায়কের প্রত্যাবর্তন ও তিনটি গান

অনুপম হায়াৎ

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মহা আনন্দের দিন। এদিন ইতিহাসের মহানায়ক স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, স্বাধীনতার স্থপতি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার সূর্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজধানী ঢাকায় পৌঁছেন। এই তারিখটি তাই মহাপ্রত্যাবর্তন দিবসও। এই প্রত্যাবর্তন কোটি বাঙালির প্রাণের মহা অনুভূতিস্নাত, স্পন্দিত, নন্দিত, গৌরব ও সৌরভমণ্ডিত।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আর সেই রাতেই পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সৈন্যরা ঢাকাসহ সারা দেশে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নারী নির্যাতন শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। তারা বঙ্গবন্ধুকে সেখানে কারাগারে বন্দি করে রাখে। এদিকে নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৭১ সালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করে। অবশেষে বাংলাদেশ ও বিশ্বজগতের চাপে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেন। জেলখানায় গিয়ে ভুট্টোই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির সংবাদটি জানান। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁকে লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে। বঙ্গবন্ধু ৮ই জানুয়ারি ইসলামাবাদ থেকে লন্ডন-দিল্লি হয়ে ১০ই জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছেন।

এ সম্পর্কে জানা যায় ভারতীয় কূটনীতিক শশাংক এস. ব্যানার্জি, সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ও বেদ মারোয়া এবং মুনতাসীর মামুনের তথ্যসূত্রে।

২

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে পিআইএ-র একটি বিমানে চড়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৯ই জানুয়ারির শেষ রাতে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখানে তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও ভারতীয় কূটনীতিকদের সাথে। তিনি বৈঠক করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে। ফোনে কথা বলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে। অতঃপর ব্রিটিশ রয়াল এয়ারফোর্সের একটি জেট বিমানে চড়ে বঙ্গবন্ধু ঢাকার উদ্দেশে নয়াদিল্লি রওয়ানা হন। এ ব্যাপারে সর্বাত্মক নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়। পথিমধ্যে বিমানটি সাইপ্রাসস্থ ব্রিটিশ বিমান ঘাঁটিতে তেল ভরে ওমান হয়ে নয়াদিল্লি পৌঁছে। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং সংবর্ধনা শেষে তিনি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বিকেলে ঢাকায় পৌঁছেন। ৮ থেকে ১০ই জানুয়ারি সুদীর্ঘ এই বিমানযাত্রায় আবেগাপ্লুত হয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলার তিন বিশিষ্ট কবির তিনটি গান গেয়েছিলেন।

গান তিনটি হলো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত '... এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' এবং অতুল প্রসাদ সেন রচিত 'আ মরি বাংলা ভাষা'।

৩

রয়াল এয়ারফোর্সের বিমানে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী ছিলেন ভারতীয় কূটনীতিক শশাংক এস. ব্যানার্জি। সাইপ্রাস থেকে তেল নিয়ে বিমানটি ওমান হয়ে নয়াদিল্লি যাবে, এসময় বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন। শশাংক ব্যানার্জির বরাত দিয়ে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন–

> বঙ্গবন্ধু উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' ব্যানার্জিকে বললেন, গলা মেলাতে। প্রথম বারেরটা হলো রিহার্সেলের মতো। দ্বিতীয়বার আবেগভরা বঙ্গবন্ধুর চোখ সজল। আবার দু'জনে বসলে বঙ্গবন্ধু ব্যানার্জিকে নিচু গলায় বললেন, তিনি চান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হবে 'আমার সোনার বাংলা'। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বিষয়টা জানলাম আমি আর আপনি।' (মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০১৮, পৃ. ৬৭-৬৮)।
>
> শশাংক ব্যানার্জির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, ভবিষ্যৎ সরকার পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়।

৪

দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে বঙ্গবন্ধু বিমান যোগে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন। তাঁর সাক্ষী হন ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা বেদ মারোয়া। বেদ মারোয়া ঐ সময় বঙ্গবন্ধুর আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে দুটি গান শোনেন বলে সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন–

> বেদ মারোয়া শেখ সাহেবের ঠিক পিছনের সিটে বসেছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন শেখ সাহেব আবৃত্তির সুরে গান গাইছেন। '... এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি...'। পর মুহূর্তে শেখ সাহেব আবার গুন গুন করে আবৃত্তি করছেন, 'আ মরি বাংলা ভাষা ... কী যাদু বাংলা গানে ...'। বেদ মারোয়া শেখ সাহেবকে অভিবাদন জানিয়ে বাংলায় বললেন, স্যার আমি বাংলা জানি। '... আমি বাংলা পড়তে পারি, বলতে পারি।' এ সময় বিমানের পাইলট জানান যে, বিমান বাংলাদেশের আকাশ সীমায় পৌঁছেছে। শেখ সাহেবের চোখ সজল হয়ে উঠলো। তিনি জানালার কাছে গিয়ে বাংলাদেশের শ্যামল প্রান্তর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। (মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ:৭০)।

বিমান তখন ঢাকা বিমানবন্দরে। বঙ্গবন্ধু আবেগে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন। বেদ মারোয়া তাঁর সিট বেল্ট বেঁধে দেন। বঙ্গবন্ধু বিমানের রানওয়েতে দাঁড়ান। 'যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষের মাথা।' (মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১)।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু ফিরলেন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে। যে দেশ 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা..., সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি'। আর 'আমার সোনার বাংলা' গানটি বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে তাঁর মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়।

অনুপম হায়াৎ: লেখক ও গবেষক

†f‡O‡Q `yqvi G‡mQ †R¨wZg©q

পেপারবুকের মোড়ক উন্মোচন

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের স্মারক প্রকাশনা *ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়* পেপারবুকের মোড়ক উন্মোচন করেন। ১৪ই জানুয়ারি গণভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ এবং উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় বক্তব্য দেওয়ার পর তিনি পেপারবুকটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

গ্রন্থটির মুখবন্ধ লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই। বইটির সম্পাদক স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মজিবুর রহমান। বিশেষ এই প্রকাশনাটি নতুন প্রজন্মের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন, অবদান এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে সহায়ক হবে। এতে বলা হয়েছে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন এদেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য। মহান মাতৃভাষা আন্দোলনে বাঙালির মানসে যে আত্মচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে ধাপে ধাপে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনে উপনীত করেন। পরাধীনতার নিগড় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক সুকঠিন ঐক্যে জোটবদ্ধ করেছেন। যৎসামান্য দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমরবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও বিপুল অস্ত্রধর হানাদার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা, এমন নেতৃত্ব নজিরবিহীন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাঙালি তার চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করে। জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনটিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে *ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়* নামের এই পেপারবুকটি প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে জয়ীতা প্রকাশনী। বইটির প্রচ্ছদ ও গ্রন্থ পরিকল্পনা করেছেন শাহরিয়ার খান বর্ণ। বইটির মূল্য ২০০০/- টাকা। পাওয়া যাবে জয়ীতা প্রকাশনীর ২০/২১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এলাকার কার্যালয়ে এবং একুশে বইমেলায়।

প্রতিবেদন: সাবিহা শিমুল

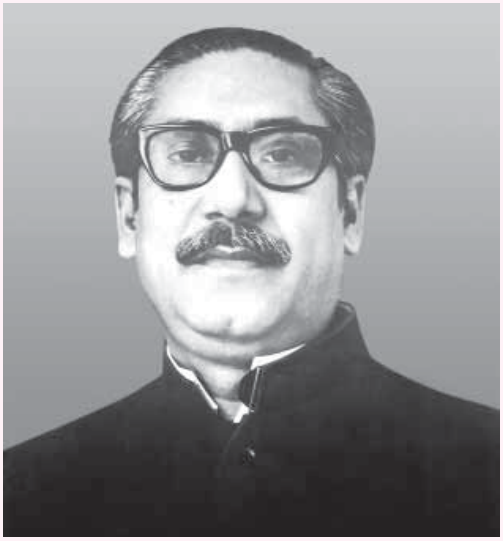

শেখ মুজিব

শেখ বংশের আলোকবর্তিকা

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

বিশ্বের একজন বাঙালি শ্রেষ্ঠ
শেখ মুজিবুর রহমান
পরাধীন বাংলাকে স্বাধীন করে
নিয়েছ সবার ওপরে স্থান।
(মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব– প্রবীর রায়)

বাঙালির অন্তরে, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। প্রকৃতির সৌন্দর্য সীমায় যেমন, তেমনি বাঙালি সত্তায়, গর্বে, বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল নাম শেখ মুজিব। মুক্তির স্বাদ দিয়ে তিনিই চলে গেছেন চিরতরে স্বার্থান্ধদের নিষ্ঠুরতায়। কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর বিভায় আলোকিত বাংলাদেশ, আলোকিত বিশ্ব। আমাদের জাতির পিতা, পৃথিবী নন্দিত এ নেতার জন্ম ফরিদপুর জেলার সে সময়ের গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। খ্যাতিমান শেখ বংশের সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। যুগ যুগ ধরে শেখ, সৈয়দ, কাজী, খন্দকার, মণ্ডল, মোড়ল, হাজারী, আকন্দ, সরকার, বিশ্বাস, চৌধুরী, মীর নানা বংশ ও পদবিতে বাংলায় মুসলিম হিন্দুরা নিজেদের পরিচিতি ও কর্মধারা বিস্তার করেছে। শেখরাও সে ধারারই অংশ। শেখ আরবি থেকে আগত পদবি। সম্ভ্রান্ত, সম্মানসূচক বংশ পদবি শেখ।

বঙ্গবন্ধুর বিবরণ থেকে জানা যায়, একসময় শেখ বংশের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট অর্থসম্পদের অধিকারী ছিলেন। এমনকি জমিদারদের সাথে তাঁদের বিরাট ব্যাবসাও ছিল। কেউ ব্যাবসা করেছেন, কেউবা সমাজের সরদার হয়ে করেছেন আচারবিচার। শেখ বংশের সন্তান হয়ে বঙ্গবন্ধু সে বংশের উন্নতির যাত্রা ব্যাহত হবার ঘটনাও লিখেছেন তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে। তাঁর জন্মের সময় শেখ পরিবারের প্রতিপত্তি কমে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে পরিণত হয়েছিল। বাড়ির বৃদ্ধ ও দেশের গণ্যমান্য প্রবীণ লোকদের নিকট থেকে জেনে নিয়ে কিছু কিছু ঘটনার কথা লিখেছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য মতে, শেখ বংশের গোড়াপত্তন করেন শেখ বোরহানউদ্দিন। একসময় সুদিন থাকলেও বঙ্গবন্ধুর বিবরণ– 'একটা দালান ভেঙে পড়েছে, যেখানে বিষাক্ত সর্পকুল দয়া করে আশ্রয় নিয়েছে। এই সকল দালান চুনকাম করার ক্ষমতা তাদের অনেকের নাই। এই বংশের অনেকেই এখন এ বাড়ির চারপাশের টিনের ঘরে বাস করে। আমি এই ঘরের এক ঘরেই জন্মগ্রহণ করি।'

শেখদের প্রতিপত্তির একটি সত্য গল্প বলেছেন বঙ্গবন্ধু– 'খুলনা জেলার আলাইপুরে মি. রাইন নামের একজন ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেব নীল চাষ শুরু করে এবং একটা কুঠি তৈরী করে। ... শেখদের নৌকার বহর ছিল, সে সব নৌকা মাল নিয়ে কলকাতায় যেত। মি. রাইন নৌকা আটক করে মাঝিদের দিয়ে কাজ করাত এবং অনেকদিন পর্যন্ত আটকে রাখত। কেউ বাধা দিলে অকথ্য অত্যাচার করত। ... শেখেরা তখনও দুর্বল হয়ে পড়ে নাই। রাইনের লোকদের সাথে কয়েক দফা হাঙ্গামা হলো এবং কোর্টে মামলা দায়ের হলো। প্রমাণ হলো রাইন অন্যায় করেছে।' এ মামলায় রাইনের জরিমানা হয় আধা পয়সা এবং শেখ কুদরতউল্লাকে রাইন বলেছিল– যত টাকা চান দেব, আমাকে অপমান করবেন না। কুদরতউল্লা বলেছিলেন– 'টাকার আমার দরকার নাই। তুমি আমার লোকের উপর অত্যাচার করেছ, আমি প্রতিশোধ নিলাম।'

ধীরে ধীরে শেখ বাড়ির পতন শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন– 'ইংরেজরা মুসলমানদের ভালো চোখে দেখত না। প্রথম ঘটনা, রাণী রাসমণি হঠাৎ জমিদার হয়ে শেখদের সাথে লড়তে শুরু করলেন, ইংরেজও তাঁকে সাহায্য করল।' রাসমণি স্টেটের সাথে শেখদের দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগেই ছিল। শেখ বাড়ির নিকটবর্তী শ্রীরামকান্দি গ্রামের দুর্ধর্ষ তমিজউদ্দিন রাণী রাসমণি স্টেটের পক্ষে শেখদের সাথে মারামারি করে আহত হয়ে মারা যায়। মামলা হয়। শেখদের সকলেই গ্রেপ্তার হয়, প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, পরে হাইকোর্ট থেকে মুক্তি মেলে। কাজীদের সাথে রেষারেষির কারণেও দুর্বল হয়ে পড়ে শেখ বংশ। বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য– 'কাজীরা অর্থ-সম্পদ ও শক্তিতে শেখদের সাথে টিকতে পারে নাই কিন্তু লড়ে গেছে বহুকাল।' *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থ থেকে জানা যায়– আত্মীয় কাজীরা শেখদের সমর্থন করত। তাদের অন্যদল রাণী রাসমণির সাথে যোগ দেয়। কারণ তারা কোনোভাবেই শেখদের আধিপত্য সহ্য করেনি। ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে সেরাজতুল্লা কাজীর তিন ছেলে এক মেয়ে অর্থের লোভে বৃদ্ধ পিতাকে গলা

টিপে হত্যা করে। লাশ শেখ বাড়ির গরুর ঘরের চালের উপর রেখে আসে। পুলিশ এসে লাশ বের করে নিয়ে যায়, বাড়ির সকলকে কাজীরা গ্রেপ্তার করিয়ে দেয়। এতে দারুণ বিপাকে পড়ে শেখরা। এর পরের ঘটনা বঙ্গবন্ধু বিবরণ দিয়ে লিখেছেন– 'আমার দাদার চাচা এবং রেণুর দাদার বাবা কলকাতা থেকে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে চলে আসেন বাড়িতে। ... বড় বড় ব্যবসায়ী, মাঝি ও ব্যাপারীরা নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে উধাও হতে শুরু করল। ...জমিদারিও নিলাম হয়ে প্রায় সবাই চলে যেতে লাগল। ...নিচের কোর্টে সবার জেল হয়ে গেল।' হাইকোর্টে মামলা গেলে উকিল ষড়যন্ত্রমূলক এ মামলার আবার তদন্তের আবেদন জানালে সিআইডি তদন্ত করে সত্য উদ্‌ঘাটন করল যে– খুনি শেখরা নয়, বৃদ্ধের সন্তানরা। তখন তাদের শাস্তি হলো, মুক্তি পেল শেখরা।

কিন্তু বাস্তবতা হলো ততদিনে শেখরা সর্বস্বান্ত। ব্যাবসা নেই, জমিদারিও শেষ, সামান্য তালুক ও খাসজমি, শেখ বংশ বেঁচে রইল শুধু খাসজমির জন্য। আর ছিল কিছু নিষ্কর জমি। মজার ব্যাপার হলো শেখদের দুর্দিনেও ইংরেজদের সহ্য করতে পারত না। ইংরেজদের সহ্য না করা ও ইংরেজি না পড়ায় তাঁরা বেশ পেছনে পড়ে গেল। শেখদের বংশ বাড়ার সাথে সাথে সম্পত্তি ভাগ হয়ে কমতে থাকে, দিন দিন অনেকের অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–'আমার দাদাদের আমল থেকেই শেখ পরিবার ইংরেজি লেখাপড়া শুরু করল। আমার দাদার অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ...আমার আব্বার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও দুই চাচার লেখাপড়া, ফুফুদের বিবাহ সমস্ত কিছুই তাঁর মাথার উপর এসে পড়ল।' বঙ্গবন্ধুর বাবা সংসারের হাল ধরতেই পড়ালেখা বাদ দিয়ে সেরেস্তাদারের চাকরি নিয়েছিলেন।

অনেকটা ক্ষয়িষ্ণু শেখ পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্ম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। গর্বিত বাবা– শেখ লুৎফর রহমান, মমতাময়ী মা– সায়ারা খাতুন। শেখ মুজিবুর রহমানের বোন চারজন– ফাতেমা বেগম, আসিয়া বেগম, আমেনা বেগম এবং লায়লা বেগম। ছোটো ভাই– শেখ আবু নাসের। বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে প্রাপ্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বংশ তালিকায় আছে– দরবেশ শেখ আউয়াল (হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (র.)-এর সঙ্গে ১৪৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় এলাকায় আসেন। তাঁর তিন পুত্র– শেখ জহির উদ্দিন, শেখ জান মাহমুদ, শেখ বোরহানউদ্দিন। শেখ বোরহানউদ্দিনের তিন পুত্র সন্তান– শেখ একরামউল্লাহ, শেখ তাজ মাহমুদ, শেখ কুদরতউল্লাহ ওরফে কদু শেখ। শেখ একরামউল্লাহর দুই ছেলে– শেখ ওয়াসিমউদ্দীন, শেখ মোহাম্মদ জাকির। শেখ মোহাম্মদ জাকিরের তিন ছেলে– শেখ আবদুল মজিদ, শেখ আব্দুর রশিদ, শেখ আবদুল হামিদ। শেখ আবদুল হামিদের তিন সন্তান– শেখ লুৎফর রহমান, শেখ শফিউর রহমান, শেখ হাবিবুর রহমান। শেখ লুৎফর রহমানের কৃতিধন্য সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ছোটো ভাই শেখ আবু নাসের। শেখ মুজিবুর রহমানের সন্তান– শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা ও শেখ রাসেল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা *শেখ মুজিব আমার পিতা* গ্রন্থে বলেছেন–'আমাদের পূর্বপুরুষেরা টুঙ্গিপড়া গ্রামে জমিজমা ক্রয় করে বসতির জন্য কলকাতা থেকে কারিগর ও মিস্ত্রি এনে দালান বাড়ি তৈরি করেন। যা সমাপ্ত হয় ১৮৫৪ সালে। এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই দালানের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭১ সালের যে দুটো দালান বসতি ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আগুন দিয়ে সে দুটোই জ্বালিয়ে দেয়। এই দালানকোঠায় বসবাস শুরু হবার পর ধীরে ধীরে বংশ বৃদ্ধি পায়। এই দালানেই উত্তর-পূর্ব কোণে টিনের চৌচালা ঘর তোলেন আমার দাদার বাবা শেখ আবদুল হামিদ। আমার দাদা শেখ লুৎফর রহমান এই বাড়িতেই সংসার গড়ে তোলেন।'

ঢাকা থেকে মাত্র ৬০ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। ইউনিয়নের নাম– পাটগাতি। এ গাঁয়ের বনেদি শেখ পরিবারে জন্ম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। পিতামাতার তৃতীয় সন্তান তিনি। নানা শেখ আবদুল মজিদ তাঁর নাম রাখেন মুজিব। মুজির অর্থ সঠিক উত্তরদাতা। বাবা-মা ডাকতেন খোকা বলে।

প্রজ্ঞা, মানবকল্যাণ ও দেশ ভালোবাসায়, সংগ্রামী চেতনায় তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক, স্বাধীনতার কাণ্ডারি, তিনিই শেখ বংশের আলোকবর্তিকা। শেখ বংশের সম্মান তিনিই বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করেছেন–

> এই বাঙলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ
> সন্ন্যাসী বেশে দেশ-বন্ধুর শান্ত-মধুর ডাক।
> শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী জীবন করিয়া দান
> মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান।
> তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর
> জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাঙলার।
> (বঙ্গবন্ধু– জসীমউদ্‌দীন)

মানুষকে ঐক্যের সুতোয় বেঁধে বাংলার স্বাধীনতার প্রদীপ্ত সূর্য ভাস্বর করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বের নেতাদের মধ্যে তাঁর অবস্থান বিপুল উচ্চতায়। পৃথিবীতে যুগে যুগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসহ স্বাধীনতা ও মানব মুক্তির আন্দোলনে বহু সংগ্রামী নেতার আবির্ভাব ঘটেছে। লুথার কিং, ফিদেল ক্যাস্ত্রো, লেলিন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জর্জ ওয়াশিংটন, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ বিপ্লবী নেতা স্ব স্ব দেশ ও জাতির মুক্তিদাতা হিসেবে বিশেষ স্মরণীয় এবং সম্মানিত। বাঙালির মুক্তিদাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পৃথিবী অবাক দৃষ্টিতে দেখেছে আপোশহীন, প্রচণ্ড সাহসী মানবিক নেতা শেখ মুজিবকে।

শেখ বংশে জন্ম নেওয়া বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে লর্ড পিটার শোর লন্ডনে এক স্মারক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব বাংলাদেশের একজন জাতীয় নেতা থেকে দক্ষিণ এশিয়ার একজন প্রভাবশালী নেতায় পরিণত হতে চলেছেন।' ফরাসি দার্শনিক আঁদ্রে মার্লোর মন্তব্য– 'আমি শেখ মুজিবের মধ্যে দ্য পলের চেয়েও বড় মাপের একজন মানুষকে দেখেছি।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ত্রো, তানজিনিয়ার জুলিয়াস নায়ারে, মিশরের আনোয়ার সাদাত, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাতসহ রাশিয়া ও অন্যান্য অনেক দেশের রাজনীতিবিদগণের সাথে সুসম্পর্ক ছিল বঙ্গবন্ধুর এবং সবাই তাঁর প্রশংসা করেছেন অকপট চিত্তে। শেখ মুজিব থেকেই শেখ বংশের যে পুনরুত্থান তা বিশেষ মর্যাদার। শেখ পরিবারের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেই বাংলাদেশের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁকে সহযোগিতা করছেন বঙ্গবন্ধুর আর এক কন্যা শেখ রেহানা। বাস্তবতা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরেই অন্যরাও শেখ বংশের বিভাময়তার আকাশ বিস্তৃত করেছেন অনেকগুণ। শেখ বংশের নিবুনিবু আলো সমুজ্জ্বল করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই তো তিনিই শেখ বংশের আলোকবর্তিকা।

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম: বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২ রাজধানীর উত্তরায় দিয়াবাড়িতে 'মেট্রোরেল লাইন-৬ ও বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল'-এর উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

স্বপ্ন নয়, মেট্রোরেল এখন বাস্তব

সেলিনা আক্তার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের উন্নয়ন যাত্রার সূচনা করেছিলেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতাহারে ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। বর্তমান সরকার সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ছয়টি মেট্রোরেল লাইনের সমন্বয়ে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা–২০৩০ গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের আওতায় চারটি মেট্রোরেল লাইনের নির্মাণ বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং দুটি মেট্রোরেল লাইন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মেট্রোরেল বাংলাদেশের নগর গণপরিবহণ ব্যবস্থায় একটি অনন্য মাইলফলক।

মেট্রোরেল বিশ্বের অনেক বড়ো শহরে গণপরিবহণের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। ১৮৬৩ সালে লন্ডনে প্রথম দ্রুত ট্রানজিট সিস্টেম চালু করা হয়েছিল, যা এখন 'লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড'-এর একটি অংশ। ১৮৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এনওয়াইতে তার প্রথম দ্রুত ট্রানজিট রেলব্যবস্থা চালু করে এবং ১৯০৪ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে সাবওয়ে প্রথমবারের জন্য খোলা হয়েছিল। এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে জাপান হলো প্রথম দেশ যেটি ১৯২৭ সালে একটি পাতাল রেলব্যবস্থা তৈরি করে। বর্তমানে বিশ্বের ৫৬টি দেশের ১৭৮টি শহরে ১৮০টি পাতাল রেলব্যবস্থা চালু রয়েছে। অপেক্ষার প্রহর শেষে আলোর মুখ দেখল স্বপ্নের মেট্রোরেল। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবেশ করেছে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ে। মেট্রোর কল্যাণে রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনের পাশাপাশি নগরবাসীর জীবনমান আরও সহজ হবে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেট্রোরেলের উদ্‌বোধন করেন ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২ সালে। ঢাকার যানজট নিরসনে মেট্রোরেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সে লক্ষ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) গঠন করা হয়। এই কোম্পানির মাধ্যমে প্রথম প্রকল্প হিসেবে নেওয়া হয় ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট লাইন-৬, যা এমআরটি-৬ নামে পরিচিত। প্রকল্পটি উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে কমলাপুর পর্যন্ত। এই প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ২১ দশমিক ২৬ কিলোমিটার। রুটে মোট ১৭টি স্টেশন থাকবে এবং রুটে ২৪টি ট্রেন সেট থাকবে। প্রতিটি ট্রেনে কোচসংখ্যা ৬; প্রতি ট্রেনের যাত্রী ধারণক্ষমতা ২,৩০৮ জন (মাঝের ৪টি কোচের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ৩৯০ জন এবং ট্রেইলার কোচের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ ৩৭৪ জন); চলাচলের সময় সকাল ৮টা থেকে শুরু (আপাতত); সর্বোচ্চ পরিকল্পিত গতি ১০০ কিলোমিটার/ঘণ্টা; যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা ঘণ্টায় ৬০ হাজার এবং দৈনিক ৫ লাখ, প্রতি ৪ মিনিটে প্রতিটি স্টেশনে একটি ট্রেন যাতায়াত করবে। একটি ট্রেন উত্তরা থেকে আগারগাঁও আসতে বিদ্যুৎ লাগবে ২ হাজার টাকার; জাতীয় গ্রিড উপকেন্দ্র ৫টি: উত্তরা, পল্লবী, তালতলা, সোনারগাঁও হোটেল ও বাংলা একাডেমি এলাকা; স্ট্যান্ডার্ড গেজ ১,৪৩৫ মিলিমিটার।

সরকার ২০১২ সালে মেট্রোরেল প্রকল্প গ্রহণ করে। বাস্তবে কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালে। এ প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে রয়েছে জাপান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (জাইকা)। শুরুতে প্রকল্পের আকার ছিল প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। সম্প্রসারণ, স্টেশন প্লাজা নির্মাণ, কিছু স্টেশনে নতুন করে জমি অধিগ্রহণ, পরামর্শকের পেছনে ব্যয় বৃদ্ধি, বাড়তি ভ্যাটের কারণে আরও প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বেড়েছে। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের লাইন-৬-এর খরচ দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাইকা দিচ্ছে ১৯ হাজার ৭১৯ কোটি টাকা। আর সরকার এই প্রকল্পে খরচ করছে ১৩ হাজার ৭৫৩ কোটি টাকা।

ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত একটি বাসে যেতে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা এবং ভিড়ের সময়ে সময় লাগে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা। মেট্রোরেলে সময় লাগবে মাত্র ৪০ মিনিট। এটি প্রত্যাশিত যে, এ ধরনের পরিবহণ মানুষের জীবনধারা পরিবর্তন করে এবং তাদের উৎপাদনশীল সময় বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মেট্রোরেল আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির একটি নতুন যুগে আবদ্ধ করেছে। উন্নত দেশগুলোয় মেট্রোরেল এবং অন্যান্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন মাধ্যমগুলোকে

একত্রিত করে একটি উন্নত রুট সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যাতে মানুষ শুধু একটি পেমেন্ট কার্ডের মাধ্যমে তাদের গন্তব্যে ভ্রমণ করতে পারে। বাংলাদেশে এরই মধ্যে মেট্রোরেল ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। মেট্রোরেলের যুগে এখন বাংলাদেশ। ঢাকায় প্রতিনিয়ত যানবাহন বৃদ্ধির কারণে যাতায়াতে ভোগান্তি বাড়ছে নগরবাসীর। স্বল্প দূরত্বের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সীমাহীন দুর্ভোগ ও সময়ের অপচয় হচ্ছে। যানজটের কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। ২০১৮ সালে পরিচালিত বুয়েটের একটি সমীক্ষা অনুসারে, ঢাকা শহরের যানজটের জন্য বার্ষিক ৪.৪ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়, যা জাতীয় বাজেটের ১০ শতাংশের বেশি। যানজটের কারণে ঢাকা মহানগরীতে দৈনিক ৫০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে কর্মজীবীদের, যার আর্থিক ক্ষতি বছরে ৩৭ হাজার কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞদের মতে, শহরে যানবাহনের গতি মানুষের হাঁটার গতির মতো ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ কিলোমিটারে চলে এসেছে। ১২ বছর আগেও ঢাকায় যানবাহনের এ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২১ কিলোমিটার।

এমআরটি লাইন-১ মেট্রোরেল প্রকল্পের অধীনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রুট। এমআরটি লাইন-১ দুটি ভিন্ন রুটে নির্মিত হবে। 'এয়ারপোর্ট রেল লিংক' নামে পরিচিত প্রথমটি কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা পরে গাজীপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। এ রুটটি হবে প্রথম ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেল ব্যবস্থা যেখানে ভূগর্ভস্থ স্টেশনও থাকবে। ২৬শে জানুয়ারি এমআরটি-১-এর নির্মাণকাজ উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মেট্রোরেলের (এমআরটি-১) বিমানবন্দর-কমলাপুর অংশ নির্মিত হবে মাটির নীচে। নতুনবাজার-পূর্বাচল অংশ হবে উড়াল। এমআরটি-১-এর ডিপো নির্মাণে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে প্রায় ৯৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ৩১ শতাংশ জমির দখল বুঝে পেয়েছে মেট্রোরেলের নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সরকারি কোম্পানি ডিএমটিসিএল। ১১টি প্যাকেজে এমআরটি-১-এর নির্মাণ হবে। প্রথম প্যাকেজে ডিপোর ভূমি উন্নয়ন হবে। ৫২ হাজার ৫৬১ কোটির এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) ৩৯ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা ঋণ দেবে। বাকি ১৩ হাজার ১১১ কোটি টাকা জোগান দেবে বাংলাদেশ সরকার।

এমআরটি-১-এর ১৯ দশমিক ৮৭২ কিলোমিটার বিমানবন্দর-কমলাপুর অংশের ১২টি স্টেশনও নির্মিত হবে মাটির নীচে। স্টেশন হবে বিমানবন্দর, টার্মিনাল-৩, খিলক্ষেত, নদ্দা, নতুন বাজার, উত্তর বাড্ডা, বাড্ডা, আফতাবনগর, রামপুরা, মালিবাগ, রাজারবাগ এবং কমলাপুর। এমআরটি-১-এর আরেকটি অংশ নির্মিত হবে নতুন বাজার থেকে পূর্বাচল পর্যন্ত। নতুন বাজারে হবে দুই অংশের ইন্টারচেইঞ্জ। ১১ দশমিক ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল অংশ পূর্বাচলের ৩০০ ফুট সড়কের ওপর নির্মিত হবে। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে চালু হবে এমআরটি-১। এতে ২৫টি ট্রেন দিনে আট লাখ যাত্রী পরিবহণ করবে। আট বগির ট্রেনগুলোর ধারণক্ষমতা তিন হাজার ৮৮ জন। ২৪ মিনিট ৩৫ সেকেন্ডে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর, কমলাপুর থেকে ৪০ মিনিটে পূর্বাচল ও ২০ মিনিট ৩৫ সেকেন্ডে নতুন বাজার থেকে পূর্বাচলে যাবে ট্রেন। এছাড়া কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত এমআরটি লাইন-৪ নির্মাণ করা হবে, যা ২০৩০ সালে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এমআরটি লাইন-২ গাবতলী থেকে চিটাগাং রোড রুটে পরিচালিত হবে, যা ২০৩০ সালে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যেখানে ১০০ বছরের পরিকল্পনাও করতে হয়েছে বা করা হয়েছে, যা আগামী ১০০ বছর পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষার জন্য পথ দেখাবে, বাংলাদেশ যে একটা নতুন যুগে প্রবেশ করেছে নতুন নতুন প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে সেটা টেনে নিয়ে যাবে বহুদূর। একটা উন্নত দেশ গড়ে তোলার জন্য যা যা অবকাঠামো প্রয়োজন, এগুলো হবে তার ভিত্তি। ২০৪১ বা তার নিকটতম পরবর্তী সময়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। রূপকল্প–২০২১, রূপকল্প–২০৪১ বা ১০০ বছরের পরিকল্পনা– এসবই হলো দেশকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নেওয়ার সুচিন্তিত পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। সরকারের প্রতিটি মেগা প্রজেক্টেরই মুনাফা অর্জনের বাণিজ্যিক দিক রয়েছে। তবে অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রকল্পের মতো কেবল মুনাফা অর্জনই সরকার প্রবর্তিত প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকার ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং সাধারণত একটি বিশাল ভর্তুকি প্রদান করে যাতে জনগণ সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষেবা থেকে উপকৃত হতে পারে। এ উদ্যোগের ফলে আর্থিক ক্ষতি হলেও দেশের অর্থনীতি অন্যান্য ক্ষেত্রে উপকৃত হবে।

মেট্রোরেল পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন হবে, যা বাংলাদেশে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। মেট্রোরেলের কারণে ট্রানজিট ব্যবস্থা বাড়বে এবং স্টেশনগুলোর আশপাশে অসংখ্য ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত ব্যাবসা গড়ে উঠবে। তদ্ব্যতীত, উন্নত পরিবহণ পরিকাঠামোর কারণে নতুন সংস্থাগুলো বিকাশের সুযোগ পাবে, অন্যদিকে বর্তমান ব্যাবসাগুলো উপকৃত হবে। সামগ্রিকভাবে স্টেশন এবং রুটের কাছাকাছি স্থাপন করা এ ব্যাবসাগুলো দেশের জিডিপিতে যথেষ্ট অবদান রাখবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে। ঢাকার রাস্তায় চলমান সব যানবাহন জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভর করে, যা পরিবেশ দূষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের উদ্যোগ চলছে। মেট্রোরেল পরিবেশ দূষণ কমিয়ে রাজধানীর পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমরাই গড়ব– এটা কোনো স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।

সেলিনা আক্তার: সহকারী তথ্য অফিসার, পিআইডি ফিচার

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: স্মরণীয় সেই দিন

মোতাহার হোসেন

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, মহান স্বাধীনতা এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশের স্থপতি, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ পূর্ণতা পেল। শত্রুমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এক ঐতিহাসিক ও গৌরবোজ্জ্বল দিন। কাজেই এ দিনটি মুক্তিকামী প্রতিটি মানুষের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয়। স্মরণীয় যে, একাত্তরের মার্চে ঢাকায় অখণ্ড পাকিস্তান পার্লামেন্টের মেজরিটি পার্টির লিডার ও আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাতের অন্ধকারে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। সেই কালরাত্রিতেই জেনারেল রাও ফরমান আলী খানের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় সামরিক অভিযানের কোড 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় ও দেশের অন্যান্য ১০টি গুরুত্বপূর্ণ শহরে ব্যাপক তাণ্ডব ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িটি ঘিরে ফেলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। অবিরাম গুলিবর্ষণের একপর্যায়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর বঙ্গবন্ধুকে জানান, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তখন পরিবারের সবাইকে ডেকে বলেন, 'ওরা আমাকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু জানবে, একদিন আমার মানুষ মুক্ত হবে। আমার আত্মা তা দেখে শান্তি পাবে।'

এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডির লয়ালপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাসদস্য ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ভারত-বাংলাদেশের যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং সেই দিনেই হয় বাংলাদেশের মহান বিজয় অর্জন।

উল্লেখ্য, লয়ালপুর জেলের সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচারকার্য সমাপ্ত হয়। পরে শেখ মুজিবুর রহমানকে ৩রা ডিসেম্বর লয়ালপুর জেল থেকে মিয়ানওয়ালি জেলের অন্ধকার কনডেম সেল ৭৩-এ স্থানান্তর করা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর মিয়ানওয়ালিতে এই মর্মে গুজব ছড়ানো হয় যে, ঢাকায় জেনারেল নিয়াজিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তাঁর সেলের সামনে কবর খননের কাজ শেষ করা হয়েছে। খণ্ডিত পাকিস্তানে তখন চরম উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, হতাশা ও শোক বিরাজমান। পাকিস্তান সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ এনে 'বিচার' শুরু করে। ৪ঠা ডিসেম্বর এ বিচার শেষ হয়। ১২টি অভিযোগের মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাসহ ছয়টি অভিযোগের দণ্ড ছিল মৃত্যু। ইয়াহিয়া তার সেনাকর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে গুলি করে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দ্রুত প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। ১৫ই ডিসেম্বর, ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের একদিন আগে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য ইয়াহিয়ার যে পরিকল্পনা ছিল তা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুকে যে সেলে রাখা হয়েছিল তার পাশেই কবর খোঁড়া হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর নির্দেশে ২৬শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানকে রাওয়ালপিন্ডির অদূরে সিহালা রেস্টহাউজে স্থানান্তর করা হয়। হঠাৎ প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সেই রেস্টহাউজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। রেডিও ও পত্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন বঙ্গবন্ধুকে তিনি অবহিত করেন, পূর্ব পাকিস্তান এখন স্বাধীন বাংলাদেশ। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে চাপ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ৬৭টি দেশের সরকারপ্রধানকে চিঠি দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে ব্রিটেনে পাঠাতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি ভোরে রাওয়ালপিন্ডির চাকলালা এয়ারপোর্ট থেকে পিআইএ-৬৩৫-এর একটি বিশেষ ফ্লাইটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে লন্ডনে প্রেরণ করা হয়। ড. কামাল হোসেন বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী ছিলেন। এয়ারপোর্টে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিদায় জানান। ফ্লাইটটি হিথ্রো এয়ারপোর্টে অবতরণের মাত্র এক ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্ট অথরিটিকে অবহিত করা হয়। বিমানটি ৮ই জানুয়ারি ভোর ৬টা ৩৬ মিনিটে হিথ্রো এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে বঙ্গবন্ধুকে 'হেড অব দ্য স্টেট' হিসেবে অভ্যর্থনা জানান। এরপর বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার রেজাউল করিম এবং ভারতীয় হাইকমিশনার আপা বি পন্থ বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ক্ল্যারিজেস হোটেলে অবস্থান করেন। যুক্তরাজ্যের বিরোধীদলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন হোটেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। হোটেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুরুত্বপূর্ণ প্রেসব্রিফিং করেন। তিনি বলেন, 'আমি স্বাধীনতার অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। কেননা, মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।' অতঃপর রাতে ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হেড অব দ্য স্টেট হিসেবে স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধু তাকে জানান, বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ পেতে আগ্রহী। তাই যুক্তরাজ্যের স্বীকৃতি বিশেষ প্রয়োজন। ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠক খুবই ফলপ্রসূ হয়। বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশম্যাটিক লিডারশিপের কারণে ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে যুক্তরাজ্য, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, কানাডা, জাপানসহ ৩৭টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭২ সালের ১৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে, যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী ও রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্তের পরিচয় বহন করে।

এরপর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ৯ই জানুয়ারি দ্য ব্রিটিশ রয়াল এয়ার ফোর্সের কমেট জেট বিমানে করে লন্ডন থেকে দিল্লি এবং দিল্লি থেকে ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বিমানটিতে বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী ছিলেন ভারতীয় কূটনীতিক ভেদ মারওয়া ও শশাঙ্ক ব্যানার্জি এবং ড. কামাল হোসেন। ১০ই জানুয়ারি সকালে বিমানটি দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত জানান। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে এক অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা জানানো হয়, যা ছিল আবেগ, উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি ভবনে 'মুজিব-ইন্দিরা' বৈঠকে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সৈন্যদের তিন মাসের মধ্যে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমানটি ঢাকার উদ্দেশে পালাম বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করেন। তখনকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামান, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা এবং লাখ লাখ মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'– স্লোগানে ঢাকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয়, অনন্যসাধারণ দিন ১০ই জানুয়ারি। পাকিস্তানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তিলাভের পর ১৯৭২ সালের এই দিনে বাংলার মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক, মহান স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। দেশের মাটিতে এসেই আবেগে আপ্লুত অশ্রুসিক্ত নয়ন থেকে ঝরে পড়া অঝোর ধারা সামলে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ময়দানে নতুন স্বদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, 'সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই। ইয়াহিয়া খান কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও হলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামে এত লোকের- প্রাণহানির নজির নেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমি জানতাম তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই।' দেশের মাটির প্রতি, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় ভরা বঙ্গবন্ধুর এ বক্তব্য বাঙালির হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মাহুতি দেওয়া মহান শহিদদের স্মরণ করেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে কয়েকটি দিন-তারিখ স্বর্ণাক্ষরে খচিত হয়ে আছে, তার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটি অন্যতম। ১০ই জানুয়ারি স্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙালির ইতিহাসের পাতায়, যতদিন রবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বহমান।

মোতাহার হোসেন : প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম, motaherbd123@gmail.com

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

শুদ্ধাচারের সকল রীতি
দেশ গড়ার মূলনীতি

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় পুরাণের ব্যবহার

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) গণমানসের কবি। তাঁর রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতায় অঙ্গাঙ্গিভাবে পুরাণের ব্যবহার রয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে পুরাণের ব্যবহার সম্ভবত নজরুল সর্বাধিক করেন। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় পুরাণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ইতিহাস ঐতিহ্য চিত্রিত হয়েছে।

নজরুল সবসময়ই পূর্বের দিনকে আগামী দিনের সাথে সম্পৃক্ত করার পক্ষে ছিলেন। নজরুল মনে করতেন ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে নতুনকে ধারণ করলে সেটি হবে অমৃত। আধুনিক গ্রিক যেমন হোমারকে পরিত্যাগ করার কথা ভাবতে পারে না– ভাবা উচিতও নয়। ঠিক তেমনই নজরুল মনে করতেন, এদেশের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাস-ঐতিহ্য-মিথ-পুরাণ পরিত্যাগ করা বা অস্বীকার করা এক ধরনের মৃত্যুরই নামান্তর। নজরুল প্রগতিশীলতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে তাঁর রচিত সাহিত্যে মিথ ব্যবহার করেন নব আঙ্গিকে, নতুন এক অভিনব চিন্তা চেতনায়। তিনি মিথকে কাহিনিনির্ভর না করে, কাব্যে মিথের ব্যবহার করেন মিথ হিসেবে নয়, নজরুল মিথকে ব্যবহার করেন ভাবের প্রতীক রূপে, কল্পনার বাহন হিসেবে। যার ফলশ্রুতিতে মিথকে পৌরাণিক গণ্ডি থেকে মুক্ত করতে পারায় সর্বজনীন ভাবের বাহন করতে পেরেছেন। তাই তো নজরুল রচিত কাব্যে মিথ হয়ে ওঠে আধুনিক ভাব প্রকাশের এক সময়োপযোগী প্রতীক। বিদ্রোহী কবিতায় কল্পনাজ্ঞানকে, ইতিহাসকে কতটা অতিক্রম করে যেতে পারে তার মূর্ত প্রতীক হিসেবে মানবসমাজ কবিতাটি পাঠে অমৃত সুধা লাভ করে।[১]

প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে এবং বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ করে কাব্যে পুরাণের ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। নজরুলও বিভিন্ন কবিতায় পুরাণের ব্যবহার করেছেন সাবলীলভাবে, দক্ষতার সাথে এবং শিল্পময়তার প্রয়োগে। বিদ্রোহী কবিতায়ও পুরাণের ব্যবহার করেছেন– নিজস্ব চৈতন্যে অনায়াস সাধ্যে যথোপযুক্ত মহিমায়। কবিতার উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় পুরাণকে নতুন বিন্যাস ও উপলব্ধিতে সন্নিবেশিত করেছেন। নজরুল পুরাণের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে কবিতায় স্থাপন করতে পেরেছেন। তিনি কবিতায় হিন্দু, মুসলিম, গ্রিক প্রভৃতি পুরাণ কাহিনি ব্যবহার করে বিদ্রোহী কবিতাকে দিয়েছেন অনন্য মাত্রা। নজরুল তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় অসংখ্য মিথ তুলে ধরেন। যেমন :'বল', 'আরশ', 'নটরাজ', 'ধূর্জটি', 'হোম-শিখা', 'সাগ্নিক', 'জমদগ্নি', 'যজ্ঞ', 'অগ্নি', 'ইন্দ্রাণী', 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী', 'রণ-তুর্য', 'কৃষ্ণ-কণ্ঠ', 'ব্যোমকেশ', 'গঙ্গোত্রী', 'মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক', 'বজ্র', 'ঈশান', 'বিষাণে', 'ওঙ্কার','ইস্রাফিল', 'পিনাক-পাণি', 'ডমরু', 'ত্রিশূল', 'ধর্মরাজ', 'চক্র', 'মহা শঙ্খ', 'প্রণব-নাদ' 'দুর্বাসা', 'বিশ্বামিত্র-শিষ্য', 'বোর্‌রাক', 'উচ্চৈঃশ্রবা', 'বাড়ব-বহ্নি', 'কালানল', 'বাসুকি', 'জিব্রাইল', 'আফিয়ার্স', 'শ্যাম', 'হাবিয়া দোযখ', 'বিষ্ণু', 'ছিন্নমস্তা', 'চণ্ডী', 'রণদা', 'জাহান্নাম', 'পুরুষোত্তম', 'পরশুরাম', 'নিঃক্ষত্রিয়', 'বলরাম', 'ভৃগু', 'সূদন' প্রভৃতি। এমন নিরঙ্কুশ প্রণোদনায় বিচিত্র শব্দের প্রয়োগ বাংলা কবিতায় প্রণয় ও প্রমিতির সঙ্গে আর দেখা যায়নি। ফলে কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি সময় অতিক্রম করে কালের দেয়ালে চিরকালের জন্য খোদিত হয়ে রইল। নজরুল বিদ্রোহী কবিতার চরণে চরণে অপূর্বভাবে প্রয়োগ করেছেন মিথ প্রসঙ্গ। মিথগুলো হলো:

চরণ ১: 'বল' বীর।[২] বল–বিদ্রোহী কবিতার প্রথম শব্দ। পবিত্র কোরানের একটি বহুল ব্যবহৃত প্রকরণ– 'কুল' অর্থাৎ বল, যা নজরুল বিদ্রোহী কবিতায় পাঁচবার উচ্চারণ করেছেন। আমরা জানি কোরানে বার বার রাসূলাল্লাহ (সা.) কে বলতে বলা হয়েছে কুল অর্থাৎ বল বা বলুন। বিদ্রোহী কাকে বলছে? তিনি তার আমিত্বকে বলেছে।[৩]

চরণ ৮: খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া।[৪] আরশ–বায়তুল মামুর থেকে সিদরাতুল মুনতাহা এবং সেখান থেকে সত্তর হাজার নূরের পর্দা পাড়ি দিয়ে মহানবী (সা.) একাই পৌঁছেছিলেন নামাকান ও নাযামানে। মিরাজে নবী করিম উর্ধ্বাকাশে তথা 'আরশ আল আজীমে' পৌঁছান।[৫]

চরণ ১৪: মহা-প্রলয়ের আমি 'নটরাজ', আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।[৬] নটরাজ–নৃত্যকলার উদ্ভাবক বলে মহাদেবের এক নাম নটরাজ। এর বিশ্ব ধ্বংসের সময়কার নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে রত হয়েছিলেন। অন্যমতে, উত্তেজক দ্রব্য পানের পর তিনি স্ত্রীর সাথে তাণ্ডব নৃত্যে রত হন।[৭]

চরণ ২২: আমি 'ধূর্জটি' আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর![৮] ধূর্জটি–হিন্দু দেবতা শিব। তিনি ত্রিমূর্তির অন্যতম। প্রলয়ের তমোগুণে রুদ্রমূর্তিতে বিশ্বসংসার হরণ করেন, সেইজন্য তিনি 'হর'। 'মহাকাল' এরই নামান্তর। তিনি বিরূপ নেত্র হেতু 'বিরুপাক্ষ', ত্রিনয়ন হেতু 'ত্রিলোচন'। মৃত্যুঞ্জয়ী বলে মৃত্যুঞ্জয়, অগ্নিনেত্রে কামদাহ হেতু 'স্মরহর'; পিনাক-এর ধনু, তাই তিনি 'পিনাকী', মস্তকে জটাজুট হেতু তিনি 'কপর্দী'। ডমরু-এর প্রিয় বাদ্য, কৈলাস প্রিয় ধাম, প্রমথগণ প্রিয় সহচর। হলাহল পানে নীলকণ্ঠ হেতু ইনি 'নীলকণ্ঠ'।[৯] মহাদেব ধূম্ররূপী বলে তিনি ধূর্জটি, মানুষের নিয়ত মঙ্গল কামনা করে বিবিধ কর্মের দ্বারা তাদের উন্নত করেন বলে তিনি শিব। পশুদের অধিপতি ও পালনকর্তা বলে তিনি পশুপতি।[১০]

চরণ ৪৪: আমি 'হোম-শিখা', আমি 'সাগ্নিক', 'জমদগ্নি'।[১১] হোম-শিখা–দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ঘৃত নিক্ষিপ্ত অগ্নি হচ্ছে

হোম, তার শিখা হোম শিখা।[১২] সাগ্নিক–যজ্ঞাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত রাখে এমন ব্রাহ্মণ; অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ। সর্বদা যজ্ঞকারী।[১৩] জমদগ্নি–ঋষিবিশেষ; পরশুরামের পিতা।[১৪] জমদগ্নি কামধেনুর অধিকারী, অগ্নিশর্মা ছিলেন বলে অগ্নি অক্ষণকারী। জমদগ্নি তাঁর পুত্রকে আদেশ করেছিলন জমদগ্নির স্ত্রী অর্থাৎ পুত্রের মাতা, রেণুকাকে হত্যা করার জন্য। আবার কামধেনুর জন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়।[১৫]

চরণ ৪৫: আমি 'যজ্ঞ', আমি পুরোহিত, আমি 'অগ্নি'।[১৬] যজ্ঞ–দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য হিন্দুদের বেদবিহিত অনুষ্ঠান; ক্রতু; যাগ; হোম। বিরাট অনুষ্ঠান; বড়ো আয়োজন।[১৭] আর্য জাতির প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান যজ্ঞ। দেবতার উদ্দেশে কোনো দ্রব্য দান করার নাম যজ্ঞ। যে গৃহস্থের হিতার্থে যাগ অনুষ্ঠিত হতো, তিনি যজমান। যিনি যজমানের হিতার্থে এই যাগকর্ম সম্পাদন করতেন তিনি যাজক বা ঋত্বিক। যাগকর্মের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক করতে হতো। প্রত্যেক কর্মেরই নির্দিষ্ট মন্ত্র ছিল। স্বায়ম্ভুব মনুর অন্যতমা কন্যা কাকুতি প্রজাপতি রুচির স্ত্রী ছিলেন। কাকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।[১৮] অগ্নি–'ভারতবর্ষের তিন জন অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি একজন ছিলেন। ঋকবেদ-সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলো সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনোও দেব সম্বন্ধে ততগুলো নাই'। অগ্নিকে ২০০ সূক্তে স্তব করা হয়েছে। অগ্নির ত্রিমূর্তি–আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। পার্থিব দেবতাদের মধ্যে অগ্নি প্রধান। জুহু নামে হাতায় করে ঘৃতাহুতি দেওয়া হতো বলে, 'জুহু' অগ্নির মুখ বা জিহ্বা। অগ্নি দেব ও মানবের মধ্যস্থ , অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না। সেজন্য অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি পার্থিব দেবতাদের মধ্যে প্রধান। বিভিন্ন নামে পরিচিত–অনল, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর, অজহস্ত, ধূমকেতু, তোমরধর, হুতাশ, হতভুজ, বহ্নি, রোহিতাশ্ব, ছাগরথ, সপ্তজিহ্বা।[১৯]

চরণ ৪৮: আমি 'ইন্দ্রাণী'-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য।[২০] ইন্দ্রাণী–ইন্দ্রের স্ত্রী, জয়ন্ত ও জয়ন্তীর মাতা। তাঁকে শচী বা ঐন্দ্রী বলা হয়। তাঁর নাম ঋগবেদে কয়েকবার উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে যে স্ত্রীকুলে তিনি বিশেষ ভাগ্যবতী। কারণ তাঁর স্বামীর কখনও বার্ধক্যজনিত মৃত্যু হবে না।[২১]

চরণ ৪৯: মম এক হাতে 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী', আর হাতে 'রণ-তুর্য'।[২২] বাঁকা বাঁশের বাঁশরি–বাঁশি নিয়ে বিদ্রোহী কবিতায় যেমন কথাবার্তা রয়েছে তেমনি লোক সাহিত্যেও এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রেমিক পুরুষ প্রিয়তমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে বাঁশির সাহায্য নিয়ে থাকেন। বাঁশির সুর শুনে রাধার মন উতলা হয়ে যেত। অনেক ক্ষেত্রে সময় না মেনে বাঁশি বাজানোর জন্যে রাধার কৃষ্ণের ওপর অভিমানও কম ছিল না। নজরুল নিজেকে যেমন কৃষ্ণের মতো প্রেমিক ভাবতেন, তেমনই একইসঙ্গে নিজেকে রণজয়ী যোদ্ধা মনে করতেন, যার এক হাতে প্রেমের বাঁশি আর অন্য হাতে 'রণ-তূর্য'।[২৩]

চরণ ৫০: আমি 'কৃষ্ণ-কণ্ঠ', মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।[২৪] কৃষ্ণ-কণ্ঠ–বিষপান করে কে কৃষ্ণ-কণ্ঠ হয়েছেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি।[২৫] সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র হতে ভয়ংকর বিষ উত্থিত হওয়ায় ভীত দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হলে জগতের হিতার্থে ব্রহ্মা মহাদেবকে এই বিষপান করতে বলেন। মহাদেব সম্মত হয়ে বিষপান করে তাঁর কণ্ঠে তা ধারণ করেন। বিষের তেজে কণ্ঠ নীল বর্ণ হয়ে যায়; কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।[২৬]

চরণ ৫১: আমি 'ব্যোমকেশ', ধরি বন্ধন-হারা ধারা 'গঙ্গোত্রীর'।[২৭] ব্যোমকেশ–মহাদেব। ব্যোম (আকাশ) কেশ যাহার। স্বর্গ হতে গঙ্গাবতরণকালে শিবের জটাসমূহ আকাশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সেইজন্য মহাদেবের আর এক নাম ব্যোমকেশ।[২৮] গঙ্গোত্রী–নিম্নাভিমুখে অবতরণকালীন গঙ্গা হিমালয়ের প্রান্তবর্তী যে স্থানে গঙ্গা নদী অবতরণ করছে।[২৯]

চরণ ৫৫: আমি যুবরাজ, 'মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক'।[৩০] মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক–এমনই এক চরণ যেখানে নিহিত রয়েছে ঐশ্বর্য ও বিলাসের শীর্ষচূড়া থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসা গৈরিকবসন জগদ্বিখ্যাত যুবরাজের প্রতিমা কিংবা চিত্রকল্প। পুনরাবৃত্তি করতে চাই 'মম রাজবেশে ম্লান গৈরিক'– যুবরাজ, গৌতম বুদ্ধেরই কবিতানিহিত প্রতিচ্ছবি।[৩১]

চরণ ৫৮ : আমি 'বজ্র', আমি 'ঈশান'-'বিষাণে' 'ওঙ্কার'।[৩২] বজ্র–বৈদিক মতে বজ্র খড়গাকার অমোঘ ও ভীষণ অস্ত্র (সারণ) বিশেষ। ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র। *মহাভারতে* বর্ণিত আছে- দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র বজ্র সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়। ইন্দ্র এই বজ্র দ্বারা বৃত্র ও অসুরদের বধ করেন।[৩৩] ঈশান–একাদশ রুদ্রের অন্যতম। শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে সূর্যমূর্তি। ঈশান পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্তী ঈশান কোণের অধিপতি।[৩৪] বিষাণ–পশুর শিং। পশুর শৃঙ্গের ন্যায় নির্মিত বাদ্যযন্ত্র; শিঙ্গা। শূকর, হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ দন্ত।[৩৫] ওঙ্কার–প্রণব।[৩৬]

চরণ ৫৯: আমি 'ইস্রাফিলের' শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার।[৩৭] ইস্রাফিল [ইস্‌রাফিল্]–চারজন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতার অন্যতম। যাঁর শিঙার ফুৎকারে কেয়ামত হবে।[৩৮]

চরণ ৬০: আমি 'পিনাক-পাণির' 'ডমরু, 'ত্রিশূল', 'ধর্মরাজের' দণ্ড।[৩৯] পিনাক-পাণি–মহাদেবের অন্য নাম। শিবের ধনু ও বাদ্যযন্ত্র পিনাক নামে খ্যাত। এর আকার ধনুকের মতো। এটি স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট একটি যষ্টি। এর দুই দিক তন্তুদ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। মহাদেব যুদ্ধকালে ইহা দ্বারা শরনিক্ষেপ ও অন্য সময়ে ইহা বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন। এই জন্য মহাদেবের নাম পিনাক-পাণি।[৪০] ডমরু–ডুগডুগি।[৪১] ত্রিশূল–ত্রি ফলকযুক্ত অস্ত্র। শিবের প্রধান অস্ত্র।[৪২] ধর্মরাজ–যমের অন্য নাম ধর্ম। তিনি মৃতদের ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা বলে ধর্মরাজ নামে বিখ্যাত। জীবদের পাপপুণ্যের তিনি বিচারকর্তা। তাঁর বাহন মহিষ এবং আয়ুধ দণ্ড।[৪৩]

চরণ ৬১: আমি 'চক্র' ও 'মহা শঙ্খ', আমি 'প্রণব-নাদ' প্রচণ্ড![৪৪] চক্র–ইহা কুণ্ডলাকার, প্রান্তভাগ উত্তম কোণ যুক্ত ও ধারাল। চক্রের কাজ– ছেদন, ভেদন, নিপাতন, ভ্রামণ ও শায়িতকরণ। চক্র প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ।[৪৫] মহা শঙ্খ- রণবাদ্য বিশেষ।[৪৬] প্রণব-নাদ–প্রণব ঈশ্বরের গূঢ় নাম, ওঁ, ওঙ্কার।[৪৭]

চরণ ৬২: আমি ক্ষ্যাপা 'দুর্বাসা'-'বিশ্বামিত্র-শিষ্য'।[৪৮] দুর্বাসা–মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও স্ত্রী অনুসূয়ার গর্ভে দুর্বাসার জন্ম হয়। তপঃপ্রভাবে তিনি তেজের আঁধার ছিলেন বটে, কিন্তু অতি কোপনস্বভাব ছিলেন বলে অনেকেই তাঁর কোপানলে দগ্ধ হন।[৪৯] বিশ্বামিত্র-শিষ্য–কিন্তু নজরুল লিখেছেন, বিশ্বামিত্র-শিষ্য বুদ্ধ বঙ্গলিপি শিখেছিলেন বাঙালি পণ্ডিত বিশ্বামিত্রের নিকট।[৫০] বিশ্বামিত্র–একজন ব্রহ্মর্ষি। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর তপস্যাবলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তিনি সপ্তর্ষিদের ঋগবেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলোর অভিবক্তা। বিশ্বামিত্র বা তদীয় বংশের ঋষিগণ এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। রাজা কুশের পুত্র কুশিক, তাঁর পুত্র গাধি ও গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র।[৫১]

চরণ ৯৩: তাজি 'বোর্‌রাক্‌' আর 'উচ্চৈঃশ্রবা' বাহন আমার।[৫২] বোর্‌রাক্‌–পক্ষবিশিষ্ট স্বর্গীয় অশ্ব–এর মুখ নারীর মতো, শরীরের বাকি অংশ ঘোড়ার আকৃতিবিশিষ্ট; যে বিদ্যুৎগতি স্বর্গীয় বাহন মে'রাজ রাত্রিতে হজরত মুহম্মদ (সা.)-কে বহন করে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করেছেন।[৫৩] উচ্চৈঃশ্রবা– ইন্দ্রের বাহন।[৫৪] উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার– উচ্চৈঃশ্রবা ইন্দ্রের ঘোড়ার সমুদ্র মন্থনে এর উৎপত্তি, উন্নত কর্ণ, সপ্তমুখ শ্বেতবর্ণ অশ্ব।[৫৫]

চরণ ৯৫: আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, 'বাড়ব-বহ্নি', 'কালানল'।[৫৬] বাড়ব-বহ্নি–সমুদ্র গর্ভস্থ অগ্নি।[৫৭] কালানল–প্রলয় অগ্নি, সর্বসংহারক বহ্নি সৃষ্টি নাশকারী অগ্নি।[৫৮]

চরণ ৯৯: ধরি 'বাসুকির' ফণা জাপটি'।[৫৯] বাসুকি–সর্পরাজ অনন্ত।[৬০] সর্পরাজ, মহর্ষি কশ্যাপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে বাসুকির জন্ম।[৬১]

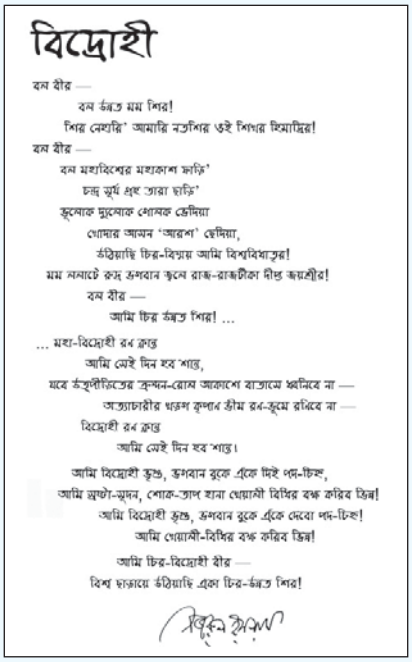

বিদ্রোহী

বল বীর —
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর —
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর —
আমি চির উন্নত শির! ...
... মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না —
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না —
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সুদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি গেয়ালী-বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর —
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

চরণ ১০০: ধরি স্বর্গীয় দূত 'জিব্রাইলের' আগুনের পাখা সাপটি'।[৬২] জিব্রাইল (আ.)– স্বর্গীয় দূত। তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে রাসূল করীম (সা.)-এর কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে আসতেন। নবীজী তাঁর সাথে মে'রাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়েছিলেন।[৬৩]

চরণ ১০৩: আমি 'আর্ফিয়াসের' বাঁশরি।[৬৪] আর্ফিয়াস–গ্রিক পুরাণোক্ত খ্যাততম কবি ও গায়ক। অ্যাপোলো তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন একটা বীণা, মিউজগণ তাঁকে তা বাজাতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর বীণা বাদনে শুধু প্রাণিকুল আনন্দিত হয়নি, জড়, পাহাড় এবং তরুও হয়ে উঠেছিল সচল।[৬৫]

চরণ ১০৭: আমি 'শ্যামের' হাতের বাঁশরি।[৬৬] শ্যাম–কৃষ্ণের অপর নাম শ্যাম। বৃন্দাবনে যখন তিনি কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন তখন থেকেই তাঁর শ্যামল দেহবর্ণের কারণে তাঁর এই নামকরণ হয়। সেখানে তাঁর হাতে থাকত বাঁশি। পরবর্তীকালে ভারতীয় পুরাণে নারায়ণ ও বিষ্ণুর সাথে তাঁকে অনেকটাই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নারায়ণের চারটি হাতে থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তার মধ্যে বাঁশিকে রাখা হয়নি।[৬৭]

চরণ ১০৯: ভয়ে সপ্ত নরক 'হাবিয়া দোযখ' নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া।[৬৮] হাবিয়া দোযখ–দোজখ আরবি শব্দ। অর্থ নরক। হাবিয়া শব্দটির অর্থ সপ্তম। এটিই নরকের সর্বনিম্ন স্তর। সর্বাধিক কষ্টকর এবং ভয়ংকর। ভারতীয় পুরাণে যেমন স্বর্গ ও নরকের কয়েকটি স্তর আছে তেমন কোরানেও বেহস্ত ও দোজখের মধ্যে অনেক স্তর আছে।[৬৯]

চরণ ১১৩: আমি ছিনিয়া আনিব 'বিষ্ণু'-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা।[৭০] বিষ্ণু–স্থিতির দেবতা। সর্বোচ্চ উপাস্য নারায়ণই বিষ্ণু। নারায়ণ বিষ্ণুরূপে জগতকে পালন করেন। এই উদ্দেশে তথা ধর্মের পালন এবং দুষ্টের দমনের জন্য বিষ্ণু অবতাররূপে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে নয়জনের আবির্ভাব হয়ে গেছে ইতোমধ্যে এবং বাকি একজনের আবির্ভাব কলিযুগের শেষলগ্নে হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।[৭১]

চরণ ১১৬: আমি 'ছিন্নমস্তা', 'চণ্ডী', আমি 'রণদা' সর্বনাশী।[৭২] ছিন্নমস্তা–পরিবর্তনশীল জগতের অধিপতি হচ্ছেন কবন্ধ। আর কবন্ধের শক্তি হলেন ছিন্নমস্তা। বিশ্বের হ্রাস-বৃদ্ধি তো সর্বদা হয়েই চলেছে। হ্রাসের মাত্রা যখন কম এবং বিকাশের মাত্রা বেশি হয় তখন ভুবনেশ্বরীর আবির্ভাব হয়। এর বিপরীত প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ নির্গম বেশি এবং আগম কম হলে ছিন্নমস্তার প্রাবল্য হয়।[৭৩] চণ্ডী– দেবী দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তিতে দেবী মহিষাসুর বধ করেন।[৭৪] নজরুল প্রবল তেজ-সম্পন্ন, অশুভ শক্তি বিনাশকারিণী অর্থে চণ্ডী ও ছিন্নমস্তা উভয়েরই নাম করেছেন।[৭৫] রণদা–রণোন্মত্তা চণ্ডী রণ-মত্তা।[৭৬]

চরণ ১১৭: আমি 'জাহান্নামের' আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি![৭৭] জাহান্নাম–শব্দটি দোজখ অর্থাৎ নরকের বিভিন্ন স্তরের একটি। কোরানে বলা হয়েছে যে, যারা বেইমান অবস্থায় মারা যায় এবং যাদের অপরাধ বা গুনাহ ক্ষমার অযোগ্য তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। জাহান্নামকে সর্বত্রই অগ্নিময় বলা হয়েছে। বিদ্রোহী কবিতায় 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি' এই উক্তিতে যেন জাহান্নামের অগ্নিময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভ করে পুষ্পের পবিত্রতা অর্জন করবার কথাই বলা হয়েছে।[৭৮]

চরণ ১২২: জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি 'পুরুষোত্তম' সত্য।[৭৯] পুরুষোত্তম–পুরুষের মধ্যে উত্তম, পুরুষের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ–বিষ্ণু। কৃষ্ণও পুরুষোত্তম নামে অভিহিত।[৮০]

চরণ ১২৬: আমি 'পরশুরামের' কঠোর কুঠার।[৮১] পরশুরাম–পুরাণের এক বর্ণময় চরিত্র। পিতার আদেশে জননীর শিরচ্ছেদ করেছিলেন তিনি। ক্ষত্রিয় রাজা কার্তবীর্য অন্যায়ভাবে পরশুরামের পিতাকে হত্যা করেছিলেন। ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাঁর প্রিয় অস্ত্র কুঠার হাতে নিয়ে সংকল্প করেছিলেন যে তিনি পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করবেন। পরশুরাম এক অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।[৮২]

চরণ ১২৭: 'নিঃক্ষত্রিয়' করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার![৮৩] নিঃক্ষত্রিয়–পরশুরাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করে গুরু কশ্যপকে পৃথিবী দান করেছিলেন। এ বিশ্বে ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য দায়ী। পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করতে পারলে শান্তি আসবে।[৮৪]

চরণ ১২৮: আমি হল 'বলরাম'-স্কন্ধে।[৮৫] বলরাম– তিনি এক অনন্তাবার। মতান্তরে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম।[৮৬] বলরাম মহাশক্তিধর। যদিও তিনি স্বভাবে যুদ্ধবাজ নন। তবুও কোনো কারণে মনের মধ্যে ক্রোধ জেগে উঠলে তিনি হলের সাহায্যেই ধ্বংসলীলায় মেতে উঠতে পারেন। এখানে বলরামের সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৮৭]

চরণ ১৩৬: আমি বিদ্রোহী 'ভৃগু', ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন।[৮৮] ভৃগু–তিনি যজ্ঞসম্ভব মহর্ষি। প্রাচীন প্রজাপতি ও সপ্তর্ষিদের অন্যতম। ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ধনুর্বেদ বিদ্যার প্রবর্তক। ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু–তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিরা এর মীমাংসার জন্য ভৃগুকে প্রথমে ব্রহ্মার কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মলোকে গিয়ে ভৃগু ইচ্ছা করে ব্রহ্মাকে সম্মান করেন না। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলে তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করে শিবের কাছে যান। সেখানেও শিবকে

সম্মান না দেখানোর জন্য শিব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তখন স্তবে শিবকে তুষ্ট করে গোলোকে গিয়ে তিনি বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখে বিষ্ণুর বক্ষস্থলে পদাঘাত করেন। জেগে উঠে ভৃগুর পা পদাঘাতে ব্যথিত হয়েছে মনে করে বিষ্ণু ভৃগুর পদসেবা করেন। বিষ্ণু ক্রোধের চিহ্ন না দেখিয়ে আরও বেশি নত ও বিনয়ী হয়ে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করেন। তখন ভৃগু স্থির করেন যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং তাঁর পূজাই শ্রেষ্ঠ। তখন থেকেই ভৃগু-পদচিহ্ন বিষ্ণুর বক্ষে চিহ্নিত আছে।[৮৯]

চরণ ১৩৭: আমি স্রষ্টা-'সূদন', শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন![৯০] সূদন–বিনাশকারী।[৯১]

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা পুরাণ ব্যবহারে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূর্ত প্রতীক নজরুল পুরাণ ব্যবহারে এক ধর্মের ঐতিহ্যের পাশাপাশি অন্য ধর্মের ঐতিহ্যকে অপরূপভাবে চিত্রিত করেছেন।

নজরুল মানসের অতলান্তিক চেতনার স্বর্ণফসল বিদ্রোহী কবিতা। পুরাণ ব্যবহারে কবিতাটি ভাব প্রকাশের এক সময়োপযোগী প্রতীক। সঞ্চিত বিচিত্র অভিজ্ঞতার তপস্যার আলোকে কবিতাটি সাহসের এক অনন্য দিশারি। বিদ্রোহী কবিতায় সমকালের ভাব সম্পদ আর্তি আকুলতার রূঢ় বাস্তবতার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

Z_¨mÎ

ক. গুলশান আরা, 'বিদ্রোহী' পুরাণের অমরাবতী, কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ স্মারক, সম্পাদক, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, প্রকাশক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ, ২৫ মে ২০২১, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর– ১, ৩, ৫, ১২, ১৫, ২৫, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬১), পৃ. ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৮, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৩৯, ৫৩৯, ৫৩৯, ৫৪০

খ. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের কবিতা সমগ্র*, প্রকাশক, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৫, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর– ২, ৪, ৬, ৮, ১১, ১৬, ২০, ২২, ২৪, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৭, ৩৯, ৪৪, ৪৮, ৫২, ৫৬, ৫৯, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭২, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৯০), পৃ. ৭, ৭, ৭, ৭, ৮, ৮, ৮, ৮, ৮, ৮, ৮, ৮, ৮, ৮, ৮, ৯, ৯, ১০, ১০, ১০, ১০, ১০, ১০, ১০, ১০, ১০, ১০, ১১, ১১, ১১, ১১, ১১

গ. *পৌরাণিক অভিধান*, সংকলিত, সুধীরচন্দ্র সরকার, প্রকাশক, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডে, কলকাতা, প্রকাশকাল, অষ্টম মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪০৮, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর– ৭, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২১, ২৬, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৪০, ৪৩, ৪৯, ৫১, ৭৪, ৮০, ৮৬, ৮৯), পৃ. ২৬২, ৫০৭, ৪২২, ৪৪০, ৭-৯, ৫৩, ৪১৯, ৩৭৬, ৩১৬, ৫৫, ২৯৪-২৯৫, ২৫১, ২২৩, ৩৫৪, ১৬৩, ৩০৪, ৩২৩, ৩৯৭-৩৯৮

ঘ. *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রধান সম্পাদক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, প্রকাশক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২, *পৌরাণিক অভিধান*, সংকলিত, সুধীরচন্দ্র সরকার, প্রকাশক, এম. সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডে, কলকাতা, প্রকাশকাল, অষ্টম মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪০৮, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর– ১৩, ১৪, ১৭, ২৯, ৩৫, ৩৮, ৫৩, ৫৪, ৬০), পৃ. ১১৩৯, ৪৫৫, ১০০৪, ৩৩৬, ৮৮৮, ১৪৪, ৯০৭, ১৪৯, ৮৬৩

ঙ. পার্থ তালুকদার, *ঐতিহ্যের ধামাইল গান*, প্রকাশক, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, একুশে বইমেলা ২০১৫, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর– ২৩), পৃ. ৩৬-৩৯

চ. ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক', নজরুলের বিদ্রোহী, সম্পাদনা, রশীদ হায়দার, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৬, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর- ৩১), পৃ. ২৮৬

ছ. শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত বাংলা অভিধান*, প্রকাশক, সদেশ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, বইমেলা, ১৪১৮, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর- ৩৬, ৪১, ৯১), পৃ. ১২০, ১৯৫, ৪৭৪

জ. গুলশান আরা, *নজরুল ভাবনা*, প্রকাশক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর- ৫০, ৬৩, ৬৫, ৭৬, ৮৪), পৃ. ১৬-১৭, ১৭, ১৭, ১৮, ১৮

ঝ. সুমিতা চক্রবর্তী, বিদ্রোহী, কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ স্মারক, পূর্বোক্ত, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর- ৬৭, ৬৯, ৭৫, ৭৮, ৮২, ৮৭), পৃ. ৯১৩-৯১৪, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৬

ঞ. *সনাতন চরিতকথা*, শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১৭ প্রকাশনা, ৪র্থ সংখ্যা, সম্পাদক, শিবপদ রায় চৌধুরী, প্রকাশক, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ২০১৭, শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির, মহেশপুর, বরুড়া, কুমিল্লা, প্রকাশকাল, ২০১৭, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর-৭১), পৃ. ১১

ট. পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য, *প্রসঙ্গ শ্যামা সঙ্গীত ও নজরুলের অবদান*, *সাহিত্য ভাস্কর নজরুল*, প্রকাশক, য়ারোয়া বুক কর্নার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯, (তথ্যের ক্রমিক নম্বর- ৭৩),পৃ. ৬৮

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য: লেখক ও নজরুল গবেষক, pijushsharmistha@gmail.com

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পুরস্কার

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস পুরস্কার পেয়েছে 'অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ' সিস্টেম। উদ্‌বোধনের পর থেকে এ পর্যন্ত এই সিস্টেমে প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ হোল্ডিং ডাটা ম্যানুয়াল থেকে ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে। অনলাইন দাখিলা (রশিদ) প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের মধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অটোমেটেড চালান সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান সৈয়দ মো. আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান। ১৩ই ডিসেম্বর ২০২২ সংবাদমাধ্যম থেকে এ তথ্য জানা যায়।

তিনি জানান, বর্তমানে অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেমের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণ ভূমি অফিসে না এসেই পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের হটলাইন ১৬১২২ নম্বরে ফোন করে অথবা ভূমিসেবা পোর্টাল land.gov.bd- এ অথবা 'ভূমি উন্নয়ন কর' মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ঘরে বসেই এনআইডি নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে তাদের ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করছেন। ভূমি মালিকগণ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে কিউআর কোড-সমৃদ্ধ যে দাখিলা পাচ্ছেন তা ম্যানুয়াল পদ্ধতির দাখিলার সমমানের এবং সর্বত্র গ্রহণযোগ্য। এছাড়া এ সিস্টেমের ফলে একদিকে একজন জমির মালিক রেজিস্ট্রেশন না করেও তার এনআইডি দিয়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে পারছেন কিংবা অটো-জেনারেটেড করের দাবির পরিমাণের বিষয়ে আপত্তি তারা জানাতে পারছেন। এনআইডি নাম্বার দিয়ে একজন জমির মালিকের সকল তথ্য এই সিস্টেম থেকে জানা সম্ভব। অন্যদিকে ভূমি অফিসের রেজিস্টারসমূহও ডিজিটাল হচ্ছে এবং ভূমি অফিসের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে আস্থার।

প্রতিবেদন: আকাশ রহমান

শেখ লুৎফর রহমানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পত্র যোগাযোগ

ইমরুল ইউসুফ

শব্দ ছুঁয়ে ছুঁয়ে হৃদয়ের ছবি আঁকাই চিঠি। কোনো কথা না বলে অনেক কথা বলাই চিঠি। কাউকে উদ্দেশ করে মনের কথা কাগজে লিখে প্রকাশের নামই চিঠি। চিঠি দূরকে করে কাছে। দুজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে করে আরও নিকটবর্তী। চিঠি মানুষের সম্পর্কসূত্র তৈরি করে। চিঠির মাধ্যমে মানুষ প্রকাশ করে ভালোবাসা। প্রকাশ করে আবেগ, উচ্ছ্বাস, আনন্দ, রাগ, ক্রোধ, ক্ষোভ, আশা, হতাশা। যে-কোনো তথ্য বিনিময়ের প্রধান মাধ্যমও তাই চিঠি। এজন্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ চিঠিকে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। তথ্য আদান-প্রদানের প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিবেচনা করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র এর রূপ বদলেছে। উপস্থাপন বদলেছে। কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চিঠি গুরুত্বহারা হয়নি।

ঐতিহাসিকভাবে চিঠির প্রচলন ছিল প্রাচীন ভারত, প্রাচীন মিশর, প্রাচীন রোম এবং চীনে। সতেরো ও আঠারো শতকে চিঠি লেখা হতো স্বশিক্ষার জন্য। চিঠি ছিল পাঠচর্চা এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা। অন্যের সঙ্গে তথ্য ও ভাব বিনিময়। চিন্তা ও ধারণা বিনিময়। তাই ব্যক্তিগত, দাপ্তরিক, কূটনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক সবধরনের চিঠি সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। চিঠি কখনো এতটাই শৈল্পিক রূপ পায় যে, তা সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে ওঠে। চিঠি কখনো সংবাদ বিনিময়ের এতটাই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে যে ওই চিঠি হয়ে যায় ইতিহাসের দলিল। যেমনটি হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাভোগ করেন। এর মধ্যে ব্রিটিশ আমলে তিনি যখন স্কুলছাত্র তখন কারাভোগ করেন ৭ দিন। বাকি ৪ হাজার ৬৭৫ দিন কারাভোগ করেছেন পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসন আমলে, যা বছরের হিসাবে প্রায় ১৩ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে বঙ্গবন্ধু জেলে বসে নানা ধরনের কাজ করেছেন। অবসর সময়ে বই, পত্রপত্রিকা পড়েছেন। চিঠিপত্র লিখেছেন। ডায়েরি লিখেছেন। মুরগি পালন করেছেন। কবুতরের বাচ্চা ফুটিয়েছেন। বন্দি সেলের বাইরের আঙিনায় ফুলের বাগান করেছেন। বাগান পরিচর্যা করেছেন। এমনকি রান্নাবান্নাও করেছেন। সব কাজের মধ্যে তিনি সারাজীবনে যে পরিমাণে চিঠি লিখেছেন তার ক্ষুদ্র সংখ্যক চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিগুলোতে তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রেম, রাজনৈতিক চিন্তা, দর্শন ও পরিকল্পনা, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, আপোশহীন সংগ্রামী মনোভাব, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা, কর্মীদের প্রতি স্নেহ এবং দায়িত্ববোধের একান্ত অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের বিষয়-আশয়।

বিভিন্ন জায়গায় দরখাস্তসহ বঙ্গবন্ধুর লেখা এবং বঙ্গবন্ধুকে লেখা সর্বমোট ৯৫টি চিঠির কপি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৭৭টি বঙ্গবন্ধুর লেখা এবং ১৮টি বঙ্গবন্ধুকে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির চিঠি। চিঠিগুলো লেখার সময় ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। বঙ্গবন্ধু

এর মধ্যে কিছু চিঠি বাংলায় এবং কিছু চিঠি ইংরেজিতে নিজ হাতে লিখেছেন। তবে বেশির ভাগ চিঠি ইংরেজিতে টাইপ কপি ও অনুলিপি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি চিঠি লিখেছেন– শেখ লুৎফর রহমান, শেখ ফজিলাতুন নেছা, শেখ হাসিনা, এম এ আজিজ, কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, জহুর আহমদ চৌধুরী, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, তাজউদ্দীন আহমদ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, প্রীতিরাণী দাশ পুরকায়স্থ, শামসুল হক, অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম, আবদুল বারি, পীর আবুল খায়ের প্রমুখ ব্যক্তির কাছে।

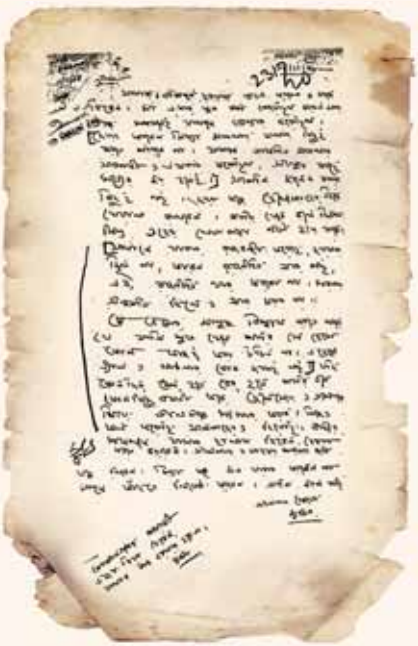

চিঠিগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য নাতিদীর্ঘ। খুব কম কথায় তিনি চিঠিগুলো লিখেছেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রাণপ্রিয় বাবাকে মাত্র একটি চিঠি লিখেছেন। আর তাঁর বাবাও প্রাণাধিক প্রিয় খোকাকে মাত্র একটি চিঠি লিখেছেন। তাঁর স্ত্রী ফজিলাতুন নেছা রেণুর কাছে লিখেছেন দুটি চিঠি। আর ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের মায়ের কাছে আচারগাঁও, ডাক : নান্দাইল, ময়মনসিংহের ঠিকানায় লেখা চিঠিতে বঙ্গবন্ধু তাকে 'আম্মা' বলে সম্বোধন করে একটি চিঠি লিখেছেন। স্ত্রী রেণুর কাছে লেখা চিঠি দুটিতে তাঁর স্নেহময়ী মা এবং বাবার কথা লিখেছেন। তাঁদের খোঁজখবর নিয়েছেন। ৭১, রাধিকা মোহন বসাক লেন থেকে ১১.০৫.১৯৫২ তারিখে রেণুর কাছে লেখা চিঠিতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন–'সকলে ভালো আছ শুনে সুখী হলাম। আমার শরীর এখন অনেকটা ভালো। আমি শীঘ্রই করাচি যাইব। খোদা করলে ঈদের সময় তোমাদের সাথে বাড়ি থাকব। কখনও মন খারাপ করিও না। শরীরের প্রতি যত্ন নিও। খোদা দিন দিবেই। হাচিনা-কামালকে বুঝাইয়া রাখিও। হাচুকে বলিও বাড়ি যাবার সময় পুতুল আনব যদি মন দিয়া পড়ে। কামালের কোনো কাজে বাধা দিও না। ওদের কিছু বলিও না। আব্বা মা যাহাতে কষ্ট পায় তাহা করিয়া লাভ কি? মুছা ভাইকে ছালাম দিও। তোমার বোন, ছেলেমেয়ে কেমন। বাড়ির সকলকে আমার ছালাম দিও।'

ঢাকা জেল থেকে ১৬.০৪.১৯৫৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু আরেকটি চিঠিতে তাঁর স্ত্রী রেণুকে লিখেছেন–'আমার ভালোবাসা নিও। ঈদের পরে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আস নাই। কারণ তুমি ঈদ করো নাই। ছেলেমেয়েরাও করে নাই। খুবই অন্যায় করেছ। ছেলেমেয়েরা ঈদে একটু আনন্দ করতে চায়। কারণ সকলেই করে। তুমি বুঝতে পার ওরা কত দুঃখ পেয়েছে। আব্বা ও মা শুনলে খুবই রাগ করবেন। আগামী দেখার সময় ওদের সকলকে নিয়ে আসিও। কেন যে চিন্তা কর বুঝি না। আমার কবে মুক্তি হবে তার কোনো ঠিক নাই। তোমার একমাত্র কাজ হবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো। টাকার দরকার হলে আব্বাকে লিখিও, কিছু কিছু মাসে মাসে দিতে পারবেন। হাচিনাকে মন দিয়ে পড়তে বলিও। কামালের স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাচ্ছে না। ওকে নিয়মিত খেতে বলিও। জামাল যেন মন দিয়ে পড়ে আর ছবি আঁকে। এবার একটা ছবি এঁকে যেন নিয়ে আসে, আমি দেখব। রেহানা খুব দুষ্ট, ওকে কিছু দিন পর স্কুলে দিয়ে দিও জামালের সাথে। যদি সময় পাও নিজেও একটু লেখাপড়া করিও। একাকী থাকতে একটু কষ্ট প্রথম প্রথম হতো। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, কোনো চিন্তা নাই। বসে বসে বই পড়ি।'

বঙ্গবন্ধুর লেখা আরও দুটি চিঠি পাওয়া যায়। যে চিঠি দুটিতে তিনি তাঁর মা-বাবার কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের ডিআইজি, আইবি বরাবর ১২.০৬.১৯৬৬ সালে লিখিত চিঠিতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন– 'I want to have an immediate interview with my wife Mrs. Fazilatun Nesa, my children Hasina, Kamal, Jamal, Rehana, Russel and my cousin Mr. Mominul Hoq.

My mother is seriously ill. I am anxious to know her condition. I will be glad if you kindly grant the interview and arrange to inform them in my Dacca Residence 677 Dhanmondi Residential Area, Road 32, Dacca.'

নীচে উল্লিখিত চিঠিটিও তিনি লিখেছেন পূর্ব পাকিস্তানের ডিআইজি, আইবি বরাবর ০৪.০৪.১৯৬৭ সালে। পিতার অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য স্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ও পুত্রকন্যাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছিলেন– 'You know my father is seriously ill. I am very anxious to know his condition. I request a special interview with my wife Mrs. Fazilatun Nesa and my children Hasina, Kamal, Jamal and others. I hope you would be kind enough to grant the interview immediately and arrange to inform them in my residence 677 Dhanmondi R/A, Dacca.'

চিঠিগুলোতে পিতামাতার প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে। প্রকাশ পেয়েছে স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি মমতা, ভালোবাসা। সন্তানদের পড়ালেখার প্রতি খেয়াল। একের প্রতি অপরের সম্পর্কের নিবিড় বন্ধন এবং সম্পর্কের গভীরতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে– বঙ্গবন্ধু তাঁর বাবাকে মাত্র একটি চিঠি লিখেছেন। আর তাঁর বাবাও প্রিয় খোকাকে মাত্র একটি চিঠি লিখেছেন। নীচে চিঠি দুটি হুবহু উপস্থাপন করা হলো।

রাজনৈতিক বন্দী

ঢাকা জেল

১২/১১/৫৮

আব্বা,

আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম গ্রহণ করবেন ও মাকে দিবেন। মা এবার খুব কষ্ট পেয়েছিল কারণ এবার তাঁর সামনেই আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল! দোয়া করবেন মিথ্যা মামলায় আমার কিছুই করতে পারবে না। আমাকে ডাকাতি মামলার আসামীও একবার করেছিল। আল্লা আছে, সত্যের জয় হবেই। আপনি জানেন আমার কিছুই নাই। দয়া করে ছেলেমেয়েদের দিকে খেয়াল রাখবেন।

বাড়ি যেতে বলে দিতাম। কিন্তু ওদের লেখাপড়া নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাকে আবার রাজবন্দী করেছে, দরকার ছিল না। কারণ রাজনীতি আর নাই, এবং রাজনীতি আর করবো না। সরকার অনুমতি দিলেও আর করব না।

যে দেশের মানুষ বিশ্বাস করতে পারে যে আমি ঘুষ খেতে পারি সে দেশে কোন কাজই করা উচিত না। এদেশে ত্যাগ ও সাধনার কোন দামই নাই। যদি কোনদিন জেল হতে বের হতে পারি তবে কোন কিছু একটা করে ছেলেমেয়ে ও আপনাদের নিয়ে ভালভাবে সংসার করব। নিজেও কষ্ট করেছি আপনাদেরও দিয়েছি। বাড়ির সকলকে আমার ছালাম দিবেন, দোয়া করতে বলবেন। আপনার ও মায়ের শরীরের প্রতি যত্ন নিবেন। চিন্তা করে মন খারাপ করবেন না। মাকে কাঁদতে নিষেধ করবেন। আমি ভাল আছি।

আপনার স্নেহের

মুজিব

নোট: গোপালগঞ্জের বাসাটি ভাড়া দিয়া দিবেন, বাসার আর দরকার হবে না। – মুজিব

শেখ লুৎফর রহমান তাঁর প্রিয় খোকাকে লিখেছেন–

বাবা খোকা,

শুরুতেই দোয়া জানিবা। তোমার ২৯/৪/৬২ তারিখের [তারিখটি সম্ভবত ভুল হয়] চিঠি একমাস পরে পাইলাম। ঢাকা হইতে ছোট্ট বউ চিঠি লিখিয়াছিল যে, তুমি শীঘ্রই মুক্তি পাইবে এবং কয়েক দিন পরেই সকলকে লইয়া আমাদের দেখিতে আসিবে। কিন্তু আজ ২০/২৫ দিন হইয়াছে আর কোনও সংবাদ পাইতেছি না। 'খোদা তায়ালা বলিয়াছেন তাহার বান্দাকে যে নির্যাতন করিবে আমি তাহাকে নির্যাতন করিব।' ইহা পূর্ব্বাপর ঘটনা হইতে সকলেই জানিতেছে এবং দুনিয়ার ইতিহাসও তাহা স্বাক্ষ্য দিতেছে। বেশী দিন হয় নাই তুমি নিজেও দেখিতে পাইয়াছ। তোমাকে আটক করিয়া রাখার অর্থ হইতেছে আমাদের মতন বৃদ্ধ পিতামাতার, নাবালক ছেলে-মেয়েদের এবং স্ত্রীর উপর অত্যাচার করা। আমরা উপায়হীন সহ্য করিতে বাধ্য কিন্তু খোদা তায়ালা নিশ্চয়ই সহ্য করিবেন না। চিন্তা করিবা না সব কিছু খোদা তায়ালার উপর নির্ভর। তিনি যাহা করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যেই করেন। সত্যের জয় হইবেই। নানা রূপ মিথ্যা মোকদ্দমা চাপাইয়া তাহাতে কোনও ফল না পাইয়া তোমার সততার ছাফাই পাইয়াছে তাহা সত্ত্বেও তুমি কিছু না করিলেও তোমাকে কেন যে আটকাইয়া রাখিতে হইবে তাহাই বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছিলাম তোমাকেই সর্ব্বাগ্রে মুক্তি দিবে কিন্তু এখনও তাহার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। দেশবাসী প্রায় সকলেই সরকার গোচরে সকল প্রকার রাজবন্দীদের এবং ছাত্রদের মুক্তির প্রার্থনা দিয়াছে। মনে হয় শীঘ্রই তোমাদের মুক্তি দিবে...। ঢাকার সকলে ভালো আছে। মীরার মার হাঁফানী উঠিয়াছিল, সেটা গোপালগঞ্জে শুনিলাম যে একটু ভাল হইয়াছে। আমরা বাড়ীর সকলেই ভাল আছি। তোমার মেজ বুজির শরীর খুবই খারাপ। সব সময় দোয়া করিতেছি এবং খোদার দরগায় প্রার্থনা যে তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন। ৮০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে এখন লেখা খুবই কঠিন। তাই খুব ধীরে লিখিতে হয় এবং লিখিতে একটু দেরী হয়।

তোমার আব্বা

[বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান টুঙ্গিপাড়া, ফরিদপুর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানায় বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ৩১.০৩.১৯৬২ তারিখে লিখিত বাজেয়াপ্ত উপরিউক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন মৌলিক এবং মানবিক জীবন। একটি মহাকাব্যিক জীবন। ব্যক্তিজীবনে তিনি অনেক চিঠিপত্র লিখেছেন। তাঁকেও অনেকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর লেখা অনেক চিঠি পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। কিন্তু তাতে কি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মানুষের প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতিতে ঘাটতি হয়েছে? মোটেও না। বরং তাঁর বক্তব্য, বাণী ও আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে-বাতাসে। ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রতিটি মানুষের মন ও মননে।

ইমরুল ইউসুফ: উপপরিচালক, বাংলা একাডেমি

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৫ই জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে ষষ্ঠবারের মতো 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০২০' দেওয়া হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক ও প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ তুলে দেওয়া হয়। এ বছর বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে পাঁচটি, মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে পাঁচটি, ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে চারটি, মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে একটি, কুটিরশিল্প ক্যাটাগরিতে দুটি এবং হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে তিনটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

এবার বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে রানার অটোমোবাইলস লিমিটেড এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। যৌথভাবে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও ফারিহা স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড এবং এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে নোমান টেরি টাওয়াল মিলস্ লিমিটেড, যৌথভাবে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে মাসকোটেক্স লিমিটেড ও এপিএস ডিজাইন ওয়ার্কস লিমিটেড। যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে বেঙ্গল পলিমার ওয়্যারস্ লিমিটেড ও অকো-টেক্স লিমিটেড। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে মাসকো ওভারসিজ লিমিটেড। যৌথভাবে দ্বিতীয় হয়েছে আব্দুল জলিল লিমিটেড এবং প্যাসিফিক সি ফুডস লিমিটেড। তৃতীয় মাধবদী ডাইং ফিনিশিং মিলস্ লিমিটেড।

মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে একটি প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে। এটি হলো মাসকো ডেইরি এন্টারপ্রাইজ। কুটিরশিল্প ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট কার্ড লিমিটেড এবং দ্বিতীয় হয়েছে রং মেলা নারী কল্যাণ সংস্থা (আরএনকেএস)। হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড, দ্বিতীয় হয়েছে মীর টেলিকম লিমিটেড এবং তৃতীয় হয়েছে সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি ২০১৩' অনুযায়ী ২০১৪ সালে প্রথমবার এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: উষা রানী রায়

ডায়াবেটিস এক নীরব ঘাতক

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

অতীতে মানুষ সংক্রামক রোগের বিষয়ে বেশি ভয় পেত। কিন্তু বর্তমান যুগে কিছু অসংক্রামক রোগ ঘাতক হিসেবে মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে। ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র একটি নন-কমিউনিকেবল (অসংক্রমণযোগ্য) রোগ, যা একবার হলে সম্পূর্ণ প্রতিকার করা সম্ভব নয়, কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে ডায়াবেটিস এক নীরব ঘাতক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ অনুযায়ী, সারা বিশ্বে এ সমস্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমান বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৪২ কোটিরও বেশি। ৩০ বছর আগের তুলনায় এই সংখ্যা এখন চার গুণেরও বেশি। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ। অথচ এদের ৫৭ শতাংশই জানে না তাদের ডায়াবেটিস রয়েছে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন, কায়িক শ্রম কমে যাওয়া, খাদ্যে নানা ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি, দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়া– সব মিলিয়ে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। রোগীদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা যখন কোনো খাবার খাই, তখন আমাদের শরীর সেই খাদ্যের শর্করাকে ভেঙে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নামক যে হরমোন নিঃসৃত হয়, তা আমাদের শরীরের কোষগুলোকে গ্লুকোজ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এই গ্লুকোজ শরীরের জ্বালানি বা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শরীরে যখন ইনসুলিন তৈরি হতে না পারে অথবা এটা ঠিক মতো কাজ না করে, তখনই ডায়াবেটিস হয় এবং এর ফলে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে।

ডায়াবেটিস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, টাইপ-১ ও টাইপ-২। টাইপ-১ (Insulin Dependent Diabetes) ডায়াবেটিস সাধারণত ছোটো বয়সেই দেখা দেয় এবং প্রত্যহ ইনসুলিন গ্রহণ ছাড়া এর কোনো চিকিৎসা নেই, অর্থাৎ ইনসুলিন নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। সাধারণত ৪০ বছর বয়সের দিকে ডায়াবেটিস এবং বংশ পরম্পরায় চলতে পারে। এই ডায়াবেটিসই টাইপ-২ (Insulin Non-Dependent Diabetes) ডায়াবেটিস। তবে এ বয়সের মানুষের পাশাপাশি ছোটোদেরও ইদানীং ডায়াবেটিস লক্ষ করা যাচ্ছে এবং তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

টাইপ-১ ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তখন রক্ত প্রবাহে গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে। এর পেছনে জিনগত কারণ থাকতে পারে অথবা অগ্ন্যাশয়ে ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো নষ্ট হয়ে গেলে এমন হতে পারে। আর টাইপ-২ ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত তাদের অগ্ন্যাশয়ে যথেষ্ট ইনসুলিন উৎপন্ন হয় না অথবা এই হরমোনটি ঠিকমতো কাজ করে না।

সন্তানসম্ভবা হলেও অনেক নারীর ডায়াবেটিস হতে পারে (Gestational Diabetes)। তাদের দেহ থেকে যখন নিজের এবং সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হতে না পারে, তখনই তাদের ডায়াবেটিস হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৬ থেকে ১৬ শতাংশ গর্ভবতী নারীর ডায়াবেটিস হতে পারে। ডায়েট, শরীর চর্চা অথবা ইনসুলিন নেওয়ার মাধ্যমে তাদের শরীরে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা গেলে তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

ক্লান্তি বোধ করা ডায়াবেটিসের একটি বড়ো উপসর্গ। সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে– খুব তৃষ্ণা পাওয়া, বার বার ক্ষুধা লাগা, স্বাভাবিকের চেয়েও ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া (বিশেষ করে রাতের বেলায়), কোনো কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া, প্রদাহজনিত রোগে বার বার আক্রান্ত হওয়া, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, শরীরের কোথাও কেটে গেলে সেটা শুকাতে দেরি হওয়া ইত্যাদি। রক্তে স্বাভাবিক গ্লুকোজের পরিমাণ ৫.৫ থেকে ৬.০ mmol/L (খালি পেটে) এবং ৭.৭ mmol/L (ভরা পেটে), কিন্তু যখন এই গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়, তখনই সে অবস্থাকে আমরা ডায়াবেটিস বলি।

রক্তে চিনির পরিমাণ বেশি হলে রক্তনালির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। শরীরে যদি রক্ত ঠিকমতো প্রবাহিত হতে না পারে, তবে যেসব জায়গায় রক্তের প্রয়োজন সেখানে রক্ত পৌঁছাতে পারে না; ফলে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এতে করে মানুষ দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে। ইনফেকশন দেখা দিতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, অন্ধত্ব, কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া, হার্ট-অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদির পেছনে একটি বড়ো কারণ ডায়াবেটিস। এছাড়া হাইপোগাইসেমিয়া, কিটোএসিডোসিস ইত্যাদি মারাত্মক জটিলতাও তৈরি হতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুধু ওষুধ বা ইনসুলিনই যথেষ্ট নয়। খাদ্যাভ্যাস, ওষুধ এবং শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে ফাস্টফুড, চিনি জাতীয় পানীয়, মিষ্টি ইত্যাদি। খেতে হবে শাকসবজি, ফল এবং মোটা দানার খাদ্যশস্যের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার। স্বাস্থ্যকর তেল, বাদাম খাওয়াও ভালো। যেসব মাছে ওমেগা থ্রি তেল আছে সেগুলো বেশি করে খেতে হবে। একবেলা পেট ভরে না খেয়ে অল্প পরিমাণে বিরতি দিয়ে খেতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মেডিসিনের মধ্যে আছে মূলত ইনসুলিন, যা বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে এবং ডোজে দেওয়া হয়। এছাড়া আছে মুখে খাওয়ার বিভিন্ন ওষুধ; যেমন: সালফোনাইলইউরিয়া, মেটফরমিন, লিনাগ্লিপটিন ইত্যাদি।

জীবনযাপনে শৃঙ্খলাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি। শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করার মাধ্যমে রক্তে চিনির মাত্রা কমিয়ে রাখা সম্ভব। প্রতি সপ্তাহে আড়াই ঘণ্টার মতো ব্যায়াম করা দরকার। দ্রুত হাঁটা এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠাও এর মধ্যে রয়েছে। শারীরিকভাবে থাকতে হবে সক্রিয়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ধূমপান পরিহার করাও জরুরি। নজর রাখতে হবে কোলেস্টেরলের মাত্রার ওপরও।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১৯৮০ সালে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ কোটি; ২০১৪ সালে তা বেড়ে হয় ৪২ কোটিরও বেশি। ১৯৮০ সালে ১৮ বছরের বেশি বয়সি মানুষের ডায়াবেটিসের হার ছিল পাঁচ শতাংশেরও কম কিন্তু ২০১৪ সালে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আট দশমিক পাঁচ শতাংশ। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন বলছে, প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের প্রায় ৮০ শতাংশ মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশের, যেখানে খুব দ্রুত খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটছে। সংস্থাটি বলছে, ২০১৬ সালে ডায়াবেটিসের কারণে বিশ্বে প্রায় ১৬ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এ রোগের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ। ২০৪০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় ডায়াবেটিস সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন সংগঠন নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সরকারি হাসপাতালগুলোয় স্বল্প খরচে ডায়াবেটিসের টেস্টগুলো করার ব্যবস্থা আছে। সরকারি টারশিয়ারি (তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত) হাসপাতালগুলোয় মেডিসিন বিভাগের পাশাপাশি এন্ডোক্রাইন (হরমোন) এবং ডায়াবেটিস বিভাগ চালু আছে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা মেডিকেলসহ দেশের বিভিন্ন মেডিকেলে ডায়াবেটিক ক্লিনিক চালু আছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন মাঠ, পার্কগুলো হাঁটার উপযোগী করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীর পাশে তৈরি হচ্ছে ওয়াকওয়ে। নিঃসন্দেহে এসব উদ্যোগ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

দেশে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় (তখন পাকিস্তান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন নামকরণ করা হয়)। ১৯৮২ সালে বারডেম বহুমূত্র প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি গঠনের লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগী কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব লাভ করে। ইউরোপের বাইরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এটাই প্রথম। এছাড়া বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্লেষকদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমাদের করণীয়, বিশেষভাবে 'ডায়াবেটিস প্রতিরোধ' বিষয়ে একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ডায়াবেটিস এখন আর কোনো ছোটোখাটো অসুস্থতা নয়। এ রোগের ব্যাপারে জনগণকে আরও সচেতন করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ডায়াবেটিস বিষয়ে কর্মশালা, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, জনগণকে ডায়াবেটিস সম্পর্কে জানানো এবং সর্বোপরি সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সরকারের পাশাপাশি আমাদেরও এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সবাই মিলে সচেতন হয়ে এগিয়ে এলে আমরা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো এবং ফিরে পাব সুস্থ স্বাভাবিক জীবন।

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী: চিকিৎসক ও লেখক

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

mwwKb Uz½xcvov
বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি

ইমরুল কায়েস

বাঙালি, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ– 'ব' দিয়ে এই তিন শব্দের ভেতরে একটি গভীর দ্যোতনা আছে। বঙ্গ, বাঙালি ও বাংলাদেশ– এই তিন ভূখণ্ডের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো বাঙালিপ্রেমী এত বড়ো নেতা দ্বিতীয়জন নেই। বঙ্গবন্ধু বাঙালির ইতিহাসের সমান বিস্তৃত। বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ এই ইতিহাসের আলেখ্য রচনা করতে গেলে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে করা যায় না। সকল কালের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি নেতা যে গ্রামের কাজলকালো মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই গ্রামের নামটিও তাঁর সাথে জড়িয়ে আছে অমোছনীয় কালিতে– টুঙ্গিপাড়া।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটি যত বই লেখা হোক না কেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি টুঙ্গিপাড়া গ্রামটি কখনই বাদ যাবে না। ভোরের সূর্য দেখলে যেমন সারা দিনের আভাস পাওয়া যায়, ঠিক তেমন মহামনীষী, মহাজ্ঞানী, মহামানব, মহাননেতাসহ অন্যান্য মহান যত জন আছেন বা ছিলেন, তাদের শিশুকাল বা বেড়ে ওঠা দেখে আশপাশের মানুষ আঁচ করতে পারতেন এই শিশু একদিন বড়ো কিছু হবে। ব্যতিক্রম না হলে তাই হয় যে, এই শিশু বা এই বালক একদিন অনেক বড়ো মানুষ হবে। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে শতভাগ ঘটেছে। স্নিগ্ধ, চপল ও স্বচ্ছ জলের মধুমতীর তীরে মধুমাখা হাওয়ায় বেড়ে ওঠা খোকার শিশুকাল, বাল্যকাল, কিশোরকালের বন্ধুবাৎসল্য মানুষের প্রতি মায়া-টান এগুলো দেখে পাড়াপ্রতিবেশীরা মা সায়ারা খাতুনকে এসে বলতেন, তোমার ছেলে একদিন অনেক বড়ো হবে। সে কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। এত বড়ো তিনি হয়েছেন– যুগে যুগে বাংলার ঘরে ঘরে যত বাঙালি সন্তান জন্মেছিল, সবার চেয়ে তিনি হয়েছেন 'শ্রেষ্ঠ সন্তান'। তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাল্যকালের বেড়ে ওঠা, শৈশবের দুরন্তপনা, কিশোরের কিচিরমিচির ও যুবক বয়সের উদ্যম সব বৈশিষ্ট্য বঙ্গবন্ধুর মধ্যে ছিল। জন্ম, বাল্যকাল, শৈশবকাল, কিশোরবেলা যে মাটির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে আছে, সে মাটি হলো টুঙ্গিপাড়ার মাটি। বঙ্গবন্ধুর ইতিহাসও টুঙ্গিপাড়ার ইতিহাসের সমান। বঙ্গবন্ধুকে বাংলার খোকা হিসেবে জানার জন্য বাংলাদেশের অন্যতম শিশুসাহিত্যিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক খালেক বিন জয়েনউদদীনের বই *সাকিন টুঙ্গীপাড়া* একটি আকর গ্রন্থ। লেখক টুঙ্গিপাড়াকে অত্যন্ত সুচারুভাবে তথ্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে তুলে ধরার পরিশ্রমী প্রয়াস রেখেছেন। গ্রন্থটির সূচিবিন্যাস নিয়ে একটু গভীরে দৃষ্টি দিলে অনুমেয় হয়। যথেষ্ট গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করে সহজ ও সাবলীল ভাষায় টুঙ্গিপাড়ার উৎপত্তি বা 'টুঙ্গি' নামটি কেমন করে এল, টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারের আগমন, শেখ পরিবারের বিস্তৃতি ও বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী জীবনের বস্তুনিষ্ঠ বয়ান তিনি তুলে ধরেছেন। কোনো পরিবারের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী অন্য আর এক পরিবার, কাজী পরিবার নিয়েও আলোচনা রয়েছে। শেখ পরিবারের গোড়াপত্তন, প্রাচীন ঢাকার তৎকালীন রাজধানী সোনারগাঁওয়ের একটি বর্ণনা এ গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। শেখ পরিবারের সাথে জমিদার রানি রাসমণির সাথে ভুল বোঝাবুঝি ও মামলা, ব্রিটিশরাজের সাথে মামলা এবং মামলায় সর্বস্বান্ত হওয়ার সত্য কাহিনি তুলে ধরে লেখক বর্ণনায় মিথ্যে আভিজাত্য আনেননি, কিংবা শেখ পরিবারের শোচনীয় পরিণতিকে লুকানোর কোনো চেষ্টাই করেননি। এদিক দিয়েই লেখক নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বইটিতে গোপালগঞ্জ জেলার নামকরণ কীভাবে মহকুমা থেকে জেলায় পরিণত হলো তারও একটি চমৎকার ইতিহাস তথ্যসূত্রসহ বর্ণনা বেশ প্রয়োজনীয়। পাটগাতী হয়ে মধুমতী গেছে দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। হাজারো গাঁও-গেরাম ধুইয়ে সাগরে-মহাসাগরে। পদ্মাবতীর যুদ্ধবাজ এক সন্তানের নাম আড়িয়াল খাঁ। আড়িয়াল খাঁর একটি শাখা ভাঙ্গা-টেকেরহাট ও রাজৈর হয়ে বাইগার বিলের মধ্যে পতিত হয়েছে। এই স্রোতধারার প্রাচীন রাজধানী কোতওয়ালীপাড়ায় বয়ে যাওয়া নাম ঘাঘর নদী। এই ঘাঘরও জল থই থই মগ্ন থেকে মিশেছে পাটগাতীর মোহনায়। পশ্চিমে মধুমতী আর পূর্বে ঘাঘর নদী। মাঝ বরাবর জলাভূমি। টঙ থেকে টুঙ্গি, জনবসতি গড়ে ওঠার পর টুঙ্গিপাড়া।

বঙ্গবন্ধুর বাবা

শেখ লুৎফর রহমানের বড়ো পরিচয় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদাতা। বিভিন্ন গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পিতার প্রসঙ্গটি স্বাভাবিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাবা বনেদি শেখ পরিবারের সন্তান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন চাকরিজীবী। ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের মহকুমা দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার। সেরেস্তাদার ফারসি শব্দ। এর অর্থ সেরেস্তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অর্থাৎ বড়ো কেরানি। পদটি আমাদের দেওয়ানি আদালতে বর্তমান।

শেখ লুৎফর রহমানরা ছিলেন সাত ভাইবোন। চার জন বোন। বোনেরা হলেন– ওবায়দুননেছা, লুৎফুননেছা, ওয়াহিদুননেছা ও করিমুননেছা। ভাইয়েরা হলেন– শেখ শফিউর রহমান ও শেখ হাবীবুর রহমান। শফিউর রহমানের কোনো উত্তরসূরি নেই।

হাবীবুর রহমানের সন্তান শেখ হাফিজুর রহমান কবি, গবেষক ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান।

শেখ লুৎফর রহমানের বাবার নাম শেখ আব্দুল হামিদ। হামিদরা হলেন তিন ভাই। অন্য দুজন হলেন– শেখ আবদুল মজিদ ও শেখ আবদুর রশিদ। আর তাঁরা ছিলেন ধনশালী ও বনেদি। সেকালে মামাও ইংরেজদের সঙ্গে লড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা, বাণিজ্য ও সম্মান-প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে ছিলেন অতি মর্যাদাবান। শেখ লুৎফর রহমানের আপন চাচাতো ভাই শেখ মোশারফ হোসেন (খান সাহেব) ছিলেন নামিদামি ব্যক্তি। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ডের সদস্য ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন।

শেখ লুৎফর রহমানের শৈশব-কৈশোর টুঙ্গিপাড়ায় কাটে। পড়াশোনাও করেন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত জিটি স্কুলে। ম্যাট্রিক পাস করেন গোপালগঞ্জ মধুরানাথ ইনস্টিটিউশন মিশন স্কুল থেকে। তবে এ কথা ঠিক, তিনি যখন পড়াশোনা করছিলেন, তখন শেখ পরিবার নানাভাবে বিভাজিত। শেখদের পরিবারের এত সংখ্যা যে, পূর্বপুরুষদের জমিজমা ভাগ-বাটোয়ারায় কমে যায়। অন্যদিকে যে জমিজমা ভাগে পড়েছিল, তাও জলা থাকার কারণে ফসল উঠত না। গোপালগঞ্জের দক্ষিণের এলাকা বিশেষ করে টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া ছিল জলাভূমি। ফসল না উঠলে মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকত না। তাই তো আমরা দেখি, শেখ লুৎফর রহমান প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েই সরকারি চাকরিতে নিজেকে নিয়োগ করেন।

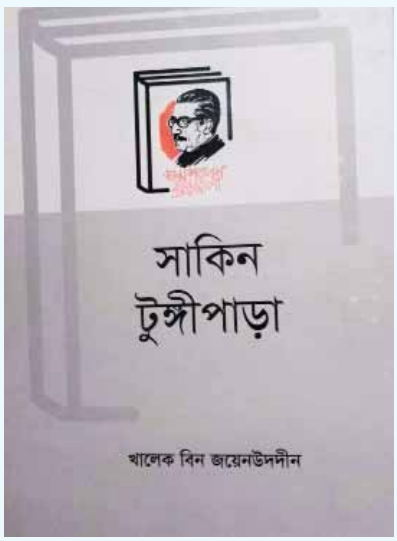

বঙ্গবন্ধুর জন্ম

বঙ্গবন্ধু ১৭ই মার্চ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছিলেন বনেদি পরিবারের সন্তান; পূর্বসূরিরা ছিলেন ইরাকি শেখ বংশীয়। কথিত আছে, পনেরো শতকে শেখ পরিবারের প্রথম পুরুষ দরবেশ শেখ আউয়াল হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.)-এর সঙ্গী হয়ে প্রথম চট্টগ্রামে আসেন। তাঁরা ছিলেন সুফিসাধক। এক পর্যায়ে হযরত বায়েজিদ (র.)-এর নির্দেশে দরবেশ আউয়াল ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিক্রমপুর পরগনার সোনারগাঁও-এ আসেন। এখানে শেখ পরিবারের দুজন পূর্বসূরির জীবন অতিবাহিত হয়। এরা ছিলেন শেখ জহিরউদ্দীন ও তেকড়ি শেখ। শেখ জহির সোনারগাঁওয়ে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ছেলে বোরহানউদ্দীন সোনারগাঁও ছেড়ে প্রথমে খুলনা পরে টুঙ্গিপাড়ায় অধিষ্ঠান হন।

শেখ বোরহানউদ্দীনের তিন ছেলে। এরা হলেন– শেখ আকরাম হোসেন, শেখ তাজ মাহমুদ ও শেখ কুদরতউল্লাহ ওরফে কদু শেখ। শেখ তাজ মাহমুদের তিন ছেলের মধ্যে এক ছেলে শেখ আবদুল হামিদ। আর এই শেখ আবদুল হামিদের একমাত্র ছেলের নাম ছিল শেখ লুৎফর রহমান। শেখ লুৎফর রহমানই বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম। বঙ্গবন্ধুরা ছিলেন ছয় ভাইবোন। এরা হলেন– ফাতেমা বেগম, আছিয়া বেগম, আমেনা বেগম, খোদেজা বেগম ও শেখ আবু নাসের।

মুজিব শুধু একজন প্রিয়তম মানুষের নাম নয়, মুজিব একটি প্রতিষ্ঠান। মুজিব একটি চেতনা। একটি বিশ্বাস। একটি আদর্শ। এটি মূল্যবোধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতা বৃত্তস্থিত তিনটি বিন্দু হলে, মুজিব সেই বৃত্তের কেন্দ্র। ইতিহাসের প্রয়োজনে মুজিব সময়ের স্বর্গীয় দূত। অমৃতের সন্তান। মুজিব বাংলার স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের স্বপ্নের রাজকুমার। মুজিব আমাদের প্রিয় স্বাধীনতার অমর কাব্যের মহাকবি। বাংলাদেশের মানচিত্র মুজিবেরই প্রচ্ছদ। গাঢ় সবুজ জমিনে রক্তলাল সূর্য খচিত আমাদের জাতীয় পতাকা, মুজিবেরই প্রতিচ্ছবি। মুজিব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ইতিহাসের রাখাল রাজা। চিরঞ্জীব কিংবদন্তি।

বঙ্গবন্ধুর বিয়ে

টুঙ্গিপাড়ার শেখ আবুল কাশেম ছিলেন খোকার দাদা আবদুল হামিদের আপন চাচাতো ভাই। আবুল কাশেমের ছেলের নাম শেখ জহিরুল হক দুদু মিয়া। এই দুদু মিয়ার সন্তানই হলো জিন্নাতুন নেছা ও ফজিলাতুন নেছা। আবুল কাশেম বেঁচে থাকতেই দুদু মিয়া অকালে মারা যান। নাতনি দুটি নিয়ে শেখ আবুল কাশেম বিপাকে পড়েন। কে করবে তাঁদের লালনপালন!

ইসলামি বিধান অনুযায়ী দাদার বর্তমানে পিতা মারা গেলে সন্তানরা দাদার সম্পত্তির অধিকারী হয় না। আবুল কাশেম তাই দুই নাতনিকে জমি-জিরেত লিখে দেন এবং নাতনি দুটিকে শিশু বয়সে বিয়ে দেন। তখন জিন্নাতুনের বয়স পাঁচ-ছয় বছর হবে আর ফজিলাতুনের তিন-চার বছর। ফজিলাতুনের ডাক নাম রেণু। রেণুর বিয়ে হয় শেখ হামিদের নাতি শেখ মুজিব ওরফে খোকার সাথে। তখন খোকার বয়স দশ-এগারো বছর। আর জিন্নাতুনের বিয়ে দেন জ্ঞাতি শেখ কুদ্দুসের ছেলে শেখ মো. মুসার সাথে। মুসার বড়ো পরিচয় তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামের পিতা, স্কুলশিক্ষক ছিলেন। রেণুর সাত বছর বয়সে তাঁর দাদাও মারা যায়। রেণু খোকাদের পরিবারে বড়ো হয়। তখন তাঁরা কেউই জানত না তাঁদের বিয়ে হয়েছে। অবশ্য রেণু ও খোকার আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয় ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে। রেণু ও খোকার সন্তানরা হলেন– শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা ও শেখ রিসালউদ্দিন ওরফে শেখ রাসেল।

বঙ্গবন্ধুর বিদ্রোহী সত্তার উন্মেষ

স্কুলের চালা দিয়ে পানি পড়ে। এর প্রতিবাদ বঙ্গবন্ধু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে করেছিলেন। যা ভাবছিলেন তাঁরা, তাই ঘটল অপরাহ্নে। ডাকবাংলো থেকে ডাক পড়ল সেই লম্বা ছেলেটিকে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ডেকেছেন। খবর শুনে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও মহকুমা প্রশাসক কাঁপতে লাগলেন। ছেলেটিকে তারা ডাকবাংলোয় পাঠিয়ে দিলেন যথাসময়ে। ডাকবাংলোর দুটি চেয়ারে বসা প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা ফজলুল হক ও বাণিজ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ছেলেটি একবুক সাহস নিয়েই ভেতরে ঢুকল।

তোমার নাম কী? প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন।

আমার নাম মুজিব, মা-বাবা খোকা বলে ডাকেন, ছেলেটির বিনম্র উত্তর।

থাকো কোথায়? আবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন।

বাবা সরকারি চাকুরে। গ্রামের বাড়ি মধুমতীর কূলঘেঁষা গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায়। ছেলেটির সহজ-সরল উত্তর। তোমার সাহস দেখে আমরা মুগ্ধ। তোমার কথাবার্তা আর দৃঢ়চেতা মনোভাব দেখে আমরা খুশি হয়েছি– বললেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি আরও বললেন, ভালোমতো পড়াশোনা করো। কলকাতায় গেলে দেখা করো। তোমার মতো ছেলেই আমাদের দরকার।

এই হলো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, বাণিজ্য ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা আলোর অভিযাত্রী

ভারতবর্ষ বিভাগের মাত্র চুয়াল্লিশ দিনের মাথায় ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ মহকুমার একদম দক্ষিণে পাটগাতী ইউনিয়নের ঘাঘর ও মধুমতী নদী বিধৌত জলে ডোবা এলাকার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে গেরস্ত পরিবারে মেয়ে শেখ হাসিনার জন্ম হয়। অবশ্য সেকালে তাঁদের পরিবারটি ছিল বনেদি। বাবা ছিলেন কলেজপড়ুয়া। দাদা লুৎফর রহমান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে। শৈশবের দিনগুলো শেখ হাসিনার কেটেছে পাখি ডাকা ও শাপলা ফোটা গ্রামে। আট বছর বয়সে তিনি প্রথম ঢাকায় আসেন।

তিনি পড়াশোনা করেন ঢাকার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কৈশোর থেকেই প্রচণ্ডভাবে রাজনীতি সচেতন। পিতৃগৃহে রাজনৈতিক পরিবেশে এবং বাবার কর্মকাণ্ড তাঁর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। তিনি সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আন্দোলন, মিছিল, মিটিংয়ে অংশ নিয়েছেন। ১৯৬৮ সালে বিয়ে হলে একদম বাঙালি পরিবারের গৃহবধূ। মাঝে একাত্তরে তাঁর দিনগুলো কেটেছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। বাবা পাকিস্তানের কারাগারে, ভাইরা মুক্তিযুদ্ধে, মা, ছোটো ভাই পাকিস্তানিদের বন্দিখানায়। আবার নিজে সন্তানসম্ভাবা। সেই দুর্বিষহ জীবন কেটে যায় যুদ্ধ জয়ে, অমানিশা দূর হয় নতুন সূর্যোদয়ে। বাবা (বঙ্গবন্ধু) ফিরে আসেন পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে। শুরু হয় বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার পালা। পঁচাত্তরে শেখ হাসিনা স্বামী বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে চলে যান জার্মানিতে। সঙ্গে নিয়ে যান সন্তানসহ ছোটো বোন শেখ রেহানাকে।

বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ

শামসুর রাহমান এই বেদনাবিধুর পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পরূপ দিয়েছেন–

> ওরা তাঁকে হত্যা করে ভেবেছিল তিনি
> সহজে হবে লুপ্ত উর্ণাজাল আর ধোঁয়াশায়,
> মাটি তাঁকে চাপা দেবে বিস্মৃতির জন্মান্ধ পাতালে–
> কিন্তু তিনি আজ সগৌরবে
> এসেছেন ফিরে দেশপ্রেমিকের দীপ্ত উচ্চারণে,
> সাধারণ মানুষের প্রখর চৈতন্যে।
> শিল্পীর তুলিতে, গায়কের গানে, কবির ছন্দে আন্দোলনে,
> রৌদ্র ঝলকিত পথে মহামিছিলের পুরোভাগে।

জাতির পিতার কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা অনেক পূর্ব থেকেই বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল সংস্কারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যে স্থানে বঙ্গবন্ধুর স্নেহশীল পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও রত্নগর্ভা মাতা সায়ারা খাতুনের সমাধিস্থল, তাঁর পাশেই বঙ্গবন্ধুকে সমাহিত করা হয়। পূর্বে অযত্ন ও অবহেলার নিদর্শন ছিল স্থানটি। এ স্থানেই প্রধানমন্ত্রী সমাধিসৌধ গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট'। ট্রাস্টের মাধ্যমে ধানমন্ডির ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া এসময় টুঙ্গিপাড়ায় সমাধিস্থলে স্মৃতিসৌধ এবং জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উল্লিখিত প্রকল্পগুলো প্রথমে সম্পূর্ণ বেসরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৮ সালে এ পরিকল্পনাগুলো প্রথমবারের মতো সরকারি ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৮ সালের ৫ই নভেম্বর 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধিসৌধ' নামে একটি বিশেষ প্রকল্প 'একনেক' (ECNEC)-এ অনুমোদিত হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে টুঙ্গিপাড়ায় শান্ত, সবুজ প্রকৃতি ও পরিবেশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকলকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ১৯৯৯ সালের ১৭ই মার্চ জাতির পিতার জন্মদিনে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নকালে টুঙ্গিপাড়ায় শোভাময় গ্রামীণ পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে কোনো জমকালো, উঁচু ইমারত গড়া হয়নি। সাধারণ মানুষ যেন স্বাচ্ছন্দ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে-ফিরে সমাধি কমপ্লেক্স এলাকা দেখতে পারে, সেই দিকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া শব্দদূষণ থেকে সমাধিস্থলকে মুক্ত রাখার জন্য পূর্বের খাল বরাবর গ্রামীণ রাস্তার পরিবর্তে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা থেকে পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত একটি বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করা হয়।

সমাধিসৌধটি নির্মাণের জন্য সর্বমোট ৩৮.৩০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ১৭১১.৮৮ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারি চুক্তি অনুযায়ী এ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। তফশিল মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২০০১ সালের ১৭ই মার্চ। সমাধিসৌধটি দুটি সমাবেশ অঙ্গন সমন্বয়ে পরিকল্পিত। এর একটি প্রার্থনা ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। আর অন্যটি জনসমাবেশ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। এ এলাকাকে একটি সংযোগ সড়ক দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। সংযোগ সড়কের দু'পাশে আবহমান গ্রামীণ পরিবেশ বজায় রাখা হয়। এমনকি পুরনো বাড়ি ও হিজলগাছ এখনও সেখানে দৃশ্যমান।

বাংলাদেশের অন্যতম শিশুসাহিত্যিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক খালেক বিন জয়েনউদদীনের বই *সাকিন টুঙ্গীপাড়া* গ্রন্থটির এসব চুম্বকীয় তথ্য ছাড়াও অনেক ঘটনার বিস্তৃত বয়ান লেখক দিয়েছেন। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া নিয়ে এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করে লেখক প্রমাণ করেছেন তিনি কতটা আপন করে বঙ্গবন্ধুকে জানেন। গ্রন্থটি পাঠকের পছন্দের শীর্ষস্থানে থাকবে বলে আশা করা যায়।

একটি মাত্র সমাধিসৌধ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মতো বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে নমস্য করা যাবে না। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের চির জাগ্রত চেতনার সৌধ।

ইমরুল কায়েস: সরকারি চাকরিজীবী, কথাসাহিত্যিক, গবেষক ও নির্বাহী সম্পাদক, নব ভাবনা

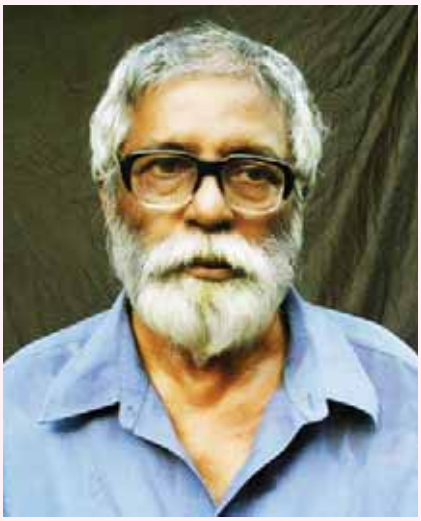

সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনে অনিবার্য নাম মুহম্মদ খসরু

অনিকেত শামীম

শুধু বাংলাদেশ আমলে নয়, পূর্ব পাকিস্তান আমলের ষাটের দশক থেকে যিনি সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্র তৈরির ব্যাপারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, তিনি আর কেউ নন– আমাদের খসরু ভাই। নামটি জড়িয়ে আছে আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসের পাতায় পাতায়। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন এবং সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এতটাই অনিবার্য এই নাম, যাকে বাদ দিলে এ ইতিহাস খণ্ডিত হয়ে যায়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ও প্রবাদ পুরুষ হিসেবে তাকে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি।

চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন এবং সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য মুহম্মদ খসরু ষাটের দশকে শুরু করেন চলচ্চিত্র বিষয়ক ম্যাগাজিন *ধ্রুপদী*। 'নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনের মুখপাত্র'– এই উপ-শিরোনামটি তিনি ব্যবহার করেছেন ধ্রুপদী'র নিচে। চলচ্চিত্রকে তিনি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাসও স্থাপন করেছেন। শুধু বিশ্বাস স্থাপন করেই ক্ষান্ত দেননি, এর জন্য যা যা দরকার সবই তিনি করেছেন ঔদার্য ও একাগ্রচিত্তে।

ধ্রুপদী'র সর্বশেষ সংখ্যাটি ৭২৪ পৃষ্ঠার বোর্ড বাঁধাই আকারে প্রকাশিত। তরুণ বয়সেই মুহম্মদ খসরু জড়িয়ে পড়েন চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে। ১৯৬৩ সালের ২৫শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ'।

চলচ্চিত্র সংসদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এর সাথে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, সংসদ আন্দোলনে পুরোধা ভূমিকা রেখেছেন আপোশহীনভাবে। সংসদের মুখপত্র *ধ্রুপদী* এবং বুলেটিন চলচ্চিত্রপত্র সম্পাদনা ছাড়াও তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *ক্যামেরা যখন রাইফেল*। ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা, চলচ্চিত্র বিষয়ক অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের আয়োজন, চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, নতুনদেরকে নির্মল সৎ চলচ্চিত্র দেখতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনকে বেগবান করতে আমৃত্যু একজন লড়াকু সৈনিক ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ: *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন* (২০০৪), *সাক্ষাৎকার চতুষ্টয়* (২০০৮)।

আমার সম্পাদিত *লোক* পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়ের আলোচনা ছাপা হতো। ২০০৪ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত লোক-এর ৭ম সংখ্যায় ঐ বছরের উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে মুহম্মদ খসরুর *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন* বইটি নিয়ে প্রায় ১৬ পৃষ্ঠার আলোচনা লেখেন জাঈদ আজিজ। জাঈদ আজিজকৃত আলোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

> *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন* শিরোনামই নির্দিষ্ট করে দেয় আমাদের সব থেকে উপেক্ষিত, অপচিত মাধ্যমেরও গৌণ ও হালে প্রায় সংরক্ষিত ধারার তৎপরতা নিয়ে লেখা এ বইটি। লেখক মুহম্মদ খসরু। বইয়ের ফ্ল্যাপে তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে 'এদেশে রুচিশীল চলচ্চিত্র দর্শক সৃজনের অগ্রনায়ক তিনি, এই-ই তার সব থেকে বড় অর্জন, সব থেকে বড় কীর্তি।' চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের একজন প্রান্তবাসী কর্মীর পক্ষেও এমত মূল্যায়ন স্বীকার করে নিতে কোনো বিসংবাদের প্রয়োজন হয় না। 'চলচ্চিত্র-অনীহ দৃশ্যান্ধ'দের দেশে চলচ্চিত্র সংস্কৃতিকে বদলে দেয়ার জন্য চল্লিশ বছর ধরে তিনি লড়ছেন। সকল অপ্রাপ্তি ও ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়েও সংগঠকের দুরূহ ভূমিকা থেকে তিনি সরে দাঁড়ান নাই কিংবা আত্মপ্রতিষ্ঠার নেশায় আচ্ছন্ন হন নাই। অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রলোভনের সুড়ঙ্গপথে পতনের অতলে তলিয়ে যাওয়া যেখানে প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে মুহম্মদ খসরু এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সংগঠকের দায়িত্ব নিয়ে এ ধরনের রক্ত-মাংস ক্ষয়ের নজির আমাদের সাংস্কৃতিক মণ্ডলে সম্ভবত আর নাই। সমালোচনার নৈর্ব্যক্তিকতা ত্যাগ করে তাই আমি এই বইয়ের পক্ষে। এভাবে এক তরফে দাঁড়িয়ে যাওয়া যদি দোষের হয়ে থাকে তবে এ লেখাটি সে অর্থে দুষ্টই থাকুক।
>
> [লোক, সংখ্যা ৭, অক্টোবর ২০০৪]

a#c`x: নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনের মুখপত্র

মূলত চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনকে বেগবান করার জন্যই প্রকাশিত হয় চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা *ধ্রুপদী*। পত্রিকা প্রকাশের চিন্তা খসরু মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত হলেও প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হয় আলমগীর কবিরের। নির্বাহী সম্পাদক: মুহম্মদ খসরু। ১৯৬৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩৮ বছরে *ধ্রুপদী*র সর্বমোট ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার পর থেকে সর্বশেষ সংখ্যা পর্যন্ত মুহম্মদ খসরু সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ সংখ্যার নির্বাহী সম্পাদক: মাহবুব আলম। সহযোগী সম্পাদক: মইনুদ্দীন খালেদ, শামীম আখতার। সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: কাইজার চৌধুরী, লাইলুন নাহার স্বেমী।

সর্বশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ করা হয়েছে ব্রাড হল্যান্ডের আঁকা ছবির উপর ভিত্তি করে মুহম্মদ খসরু পরিকল্পিত *নামহীন গোত্রহীন* ছবির শেষদৃশ্য অবলম্বনে সেলিম আহমেদ কর্তৃক আঁকা ছবি দিয়ে। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত নদী সাঁতরে পার হওয়া এক মুক্তিযোদ্ধার ডান হাতে উঁচু করে ধরে রাখা বন্দুকটি জানান দেয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরত্বগাথা। অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রক হিসেবে ছাপা হয়েছে পাঠক সমাবেশ। তিনটি পর্বে সাজানো সংখ্যার সূচিপত্রটি এখানে উল্লেখ করলাম:

বাংলাদেশ পর্ব

প্রথম চলচ্চিত্রকার: হীরালাল সেন/ মইনুদ্দীন খালেদ; পুরোনো দিনের পুরোনো ছবি/শামসুর রাহমান; বায়োস্কোপ: কিছু স্মৃতি/ মিজানুর রহমান; রণেশ দা'র সান্নিধ্য/ মুহম্মদ খসরু; রণেশ দা: অভিন্ন সত্তায় একজন শিল্পী ও মজুর/ সন্তোষ গুপ্ত; আমাদের চলচ্চিত্রের কাছে স্বাধীনতার চাহিদা/ রণেশ দাশ গুপ্ত; ফিল্ম সোসাইটির ভূমিকা/ রণেশ দাশ গুপ্ত; বইয়ের জন্য ছবি, না ছবির জন্য বই/ রণেশ দাশ গুপ্ত; সুচরিত চৌধুরী: একটি অকাল বিয়োগ/ শুভাশিষ চৌধুরী; সুচরিত চৌধুরীর সাহিত্যে চলচ্চিত্রময়তা/ শৈবাল চৌধুরী; সেদিনের ছবির কথা/ সুচরিত চৌধুরী; শতবর্ষের আলোকে তিন বাঙ্গালী অভিনেত্রী/ হাসনা বেগম; মুহম্মদ খসরুর সাথে কথাবার্তা/ মাহবুব আলম; সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)/ অ্যান্ড্রু রবিনসন; সত্যজিৎ রায় ও তাঁর চলচ্চিত্রের পরিপ্রেক্ষিত/ শামীম আখতার; পক্ষিরাজ, উড়ে যা... ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক'/ জিম সুপানিক; 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' কিছু অনুচিন্তন/ মনিরুল ইসলাম; *ধ্রুপদী* সম্পাদক মুহম্মদ খসরু-কে লেখা পত্রাবলী; অন্ধ চোখে চলচ্চিত্র/ সাজ্জাদ শরীফ; বিকল্পধারার চলচ্চিত্রের স্বকল্প ভাবনা এবং সাম্প্রতিক জল্পকল্প; একটি প্রতিবেদন/ তারেক আহমেদ; সত্যজিতের রবীন্দ্রনাথ/ বেলাল চৌধুরী; বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প/ অসীম রায়।

ক্রোড়পত্র: দক্ষিণ ভারত ও মালয়ালাম

দক্ষিণ খুলেছে দ্বার/ ফারুক আলমগীর; সিনেমা ও সমাজ-বিন্যাস/ আদুর গোপাল কৃষ্ণান; অরবিন্দনের জন্য শোকগাথ/ তাদাও সাতো; চলচ্চিত্র অভিনেতা/ আদুর গোপাল কৃষ্ণান; অরবিন্দন ও তাঁর ছবি/ রাজেশ রাঠোর; আদুর গোপাল কৃষ্ণান-এর সাথে সাক্ষাৎকার/ মুহম্মদ খসরু; মৃত্যাঞ্জলি: অরবিন্দনের প্রতি/ মুহম্মদ খসরু; প্যারালাল সিনেমা: একটি দৃষ্টিভঙ্গি/ আদুর গোপাল কৃষ্ণান; আদুর গোপাল কৃষ্ণান-এর 'কথাপূরুষন' চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য/ অনুবাদ: শাকের চৌধুরী।

ক্রোড়পত্র: লাতিন আমেরিকার ছবি

লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী চলচ্চিত্র/ মাইকেল শ্যানান; চলচ্চিত্র ও কিউবার বিপ্লব: সূচনা পর্বের পঁচিশ বছর/ জুলিয়ান বার্টন; প্রামাণ্য বাস্তববাদের উৎস/ ফার্নেন্দো বিরি; গ্লাউবের রউসা: নোভো চলচ্চিত্রের প্রাণ পুরুষ/ গ্লাউবের রউসা; ক্ষুধার নন্দনতত্ত্ব/ গ্লাউবের রউসা; লোকবাদ নিপাত যাক/ গ্লাউবের রউসা; গ্লাউবের রউসা'র সাথে সাক্ষাৎকার/ গ্যারি ক্রাউডুস, উইলিয়াম স্টার; আর্নেস্তো কার্দেনালের কবিতা ও চলচ্চিত্রের ভাষা/ আর্নেস্তো কার্দেনাল; আর্নেস্তো কার্দেনাল-এর 'জিরো আওয়ার' থেকে দুটি কবিতা/ আর্নেস্তো কার্দেনাল; ব্যুহভেদী ছবি/ গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, মিগুয়েল লিতিন; নোভো আন্দোলনের অন্তিম সঙ্গীত/ ইভা হেপনারোভা; তৃতীয় চলচ্চিত্রের লক্ষ্যে/ সোলানাস, গেতিনো।

সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার অনেক আগে থেকেই বেশ কয়েকবছর ধরে খসরু ভাই *ধ্রুপদী*'র সর্বশেষ সংখ্যার কাজ গুছাচ্ছিলেন। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *ধ্রুপদী*'র পঞ্চম সংখ্যা। প্রায় একুশ বছর পর বেরোয় সর্বশেষ অর্থাৎ ষষ্ঠ সংখ্যা। মুহম্মদ খসরু অনেক পরিশ্রম ও মেধার সমন্বয় ঘটিয়েছেন এই সংখ্যা প্রকাশে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থায় সহকারী আলোকচিত্রী (ক্যামেরাম্যান) হিসেবে যোগদান করে প্রধান আলোকচিত্রী হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। শোনা যায় পেনশনের একটি বড়ো অংশ তিনি *ধ্রুপদী*'র জন্য খরচ করেছেন।

Pjw”PÎcÎ: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফিল্ম বুলেটিন

ধ্রুপদী ছিল অনিয়মিত, চলচ্চিত্র বিষয়ক সমৃদ্ধ একটি পত্রিকা। অন্যদিকে *চলচ্চিত্রপত্র* ছিল প্রায় নিয়মিত, ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হতো। ১৯৭৫ সালে *চলচ্চিত্রপত্র*'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অনিন্দ্য সম্পাদক হাবিব ওয়াহিদ আমাকে *চলচ্চিত্রপত্র*'র কয়েকটি সংখ্যার ফটোকপি দিয়েছেন। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮০ সংখ্যার প্রিন্টার্স লাইন থেকে জানা যায় মুহম্মদ খসরু এবং মাহবুব আলমের যৌথ সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। যেহেতু প্রিন্টার্স লাইনে ১৯৮০ সালে ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশকাল উল্লেখ আছে, সেহেতু হিসাব করা যায় ১৯৭৫ সালে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন: কাইজার চৌধুরী, মানজারে হাসীন মুরাদ ও তানভীর মোকাম্মেল। নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন মুজাহিদ শরীফ ও নকিব ফিরোজ। বিভিন্ন সংখ্যার প্রচ্ছদ ও স্কেচ এঁকেছেন– গোলাম সারোয়ার, শিশির ভট্টাচার্য, নিসার হোসেন, আসেম আনসারী প্রমুখ। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত প্রিন্টার্স লাইনের তথ্য থেকে জানা যায়, সম্পাদক: মুহম্মদ খসরু, নির্বাহী সম্পাদক: মাহবুব আলম, যুগ্ম সম্পাদক: কাইজার চৌধুরী, সৈয়দ শাহীন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: শ্যামল দত্ত, প্রকাশনা সহযোগী: মোহাম্মদ আবদুর রউফ, ব্রাত্য রাইসু, আয়েশা সিদ্দীকা ঝর্ণা। একমাত্র পরিবেশক ছিল: ম্যারিয়েটা, ১৪২ স্টেডিয়াম (উপরতলা), ঢাকা।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফিল্ম বুলেটিন *চলচ্চিত্রপত্র*'র কয়েকটি সংখ্যা ঘেঁটে চলচ্চিত্র বিষয়ক অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যায়, এক অর্থে বলা চলে চলচ্চিত্র বিষয়ক তথ্য ভাণ্ডার। দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র বিষয়ক অনেক অনুসন্ধানী লেখায় সমৃদ্ধ প্রতিটি সংখ্যা। এবং চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের লেখার পাশাপাশি চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের লেখাও স্থান পেয়েছে বিভিন্ন সংখ্যায়।

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের বিশ বছর (১৯৬৩-১৯৮৩) উপলক্ষে প্রকাশিত *চলচ্চিত্রপত্র*'র সংখ্যায় মুহম্মদ খসরু 'বিশ বছরের পথ পরিক্রমা' শিরোনামে একটি লেখা লেখেন। লেখাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

> আজ থেকে বিশ বছর আগে এদেশে সৎ ছবি নির্মাণ এবং তার সঠিক মূল্যায়নের অভিপ্রায়ে যে চলচ্চিত্র সংসদ স্থাপিত হয়েছিল তার বহুবিধ অঙ্গীকার এবং প্রতিশ্রুতির মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের দেয়া কাঠামো অনুযায়ী স্থাপিত হয় এদেশে প্রথম ফিল্ম আর্কাইভ।
>
> অনেক বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়ে এদেশে চলচ্চিত্র সংসদগুলি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে এটা অত্যন্ত আশার কথা। ভাবতে সাহস হয় প্রতিশ্রুত কোন সংগ্রামী প্রচেষ্টা বৃথা যেতে পারে না। যাবতীয় হতাশার গণ্ডী ভেদ করে এই চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন তার প্রাপ্য দাবী আদায় করে নিয়ে সঠিক পথে ধাবিত হবেই– বিশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে একথা উচ্চারণ করতে কোন দ্বিধা নেই।

চলচ্চিত্রপত্র'র বিভিন্ন সংখ্যা থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখার শিরোনাম লেখকের নামসহ এখানে তুলে ধরছি:

প্রতিবাদের চলচ্চিত্র/ আলী যাকের; ক্রুশবিদ্ধ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন/ মুহম্মদ খসরু; চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে কারাভোগের আমন্ত্রণ/ মাহবুব আলম; রুটস: সেলুলয়েডে মহাকাব্য/ তানভীর

মোকাম্মেল; মগ্নচৈতন্যে উল্কাপাত: লুই বুনুয়েল/ শামীম আখতার; সেন্সরের বজ্র আঁটুনিতে রুদ্ধশ্বাস চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন/ মাহবুব আলম; ফ্ল্যাশব্যাক: *ধ্রুপদী* প্রথম সংখ্যা/ শামসুর রাহমান; নীল কণ্ঠে মরণোত্তর কারণ-বারি/ কায়েস আহমেদ; মনিপুরী চলচ্চিত্র ও ইমাগী নিংথেম/ মনিহার সিংহ; চলচ্চিত্র সমালোচনা বনাম আস্বাদন এবং শীতল পাটির বৈঠক/ সুকদেব বসু; বাংলা চলচ্চিত্রে রাজনীতি/ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়; চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন: সঙ্কটের প্রেক্ষাপট/ তারেক আহমেদ; ভিস্যুয়াল মাধ্যম: একটি জরুরী প্রস্তাবনা/ সঞ্জীব চৌধুরী; তৃতীয় মাধ্যম/ সৈয়দ তারিক; গণতান্ত্রিক রূপান্তরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও কমিউনিস্টদের ভূমিকা প্রসঙ্গে/ তরুণ গায়েন; সরকারী চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এফডিসি ও ডিএফপি'র ভূমিকা/ জীবন চৌধুরী; হু উইল কাস্ট দ্য ফাস্ট স্টোন– একটি মূল্যায়ন/ আয়েশা সিদ্দীকা ঝর্ণা; মিডিয়া আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়/ মুহম্মদ খসরু... ইত্যাদি লেখায় সমৃদ্ধ *চলচ্চিত্রপত্র*'র সংখ্যাগুলি। তাছাড়া অনেক অনূদিত লেখাও ছাপা হয়েছে *চলচ্চিত্রপত্র*'র বিভিন্ন সংখ্যায়।

যারা চলচ্চিত্র নিয়ে মাথা ঘামান, চলচ্চিত্র নিয়ে যাদের একটু-আধটু ঔৎসুক্য আছে, এমনকি চলচ্চিত্র নিয়ে যারা গবেষণা করছেন বা ভবিষ্যতে করবেন, তাদের জন্য মুহম্মদ খসরু সম্পাদিত *ধ্রুপদী* ও *চলচ্চিত্রপত্র* পত্রিকাটি অবশ্য পাঠ্য বলে আমি মনে করি। *ধ্রুপদী* ও *চলচ্চিত্রপত্র*'র সবগুলো সংখ্যা একত্রিত করে কোনো প্রকাশক বা অন্য কোনো সংস্থা কিংবা মুহম্মদ খসরুর আঁতুরঘর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ যদি বই আকারে প্রকাশ করার দায়িত্ব নেন তাহলে চলচ্চিত্র বিষয়ক বড়ো একটি কাজ সম্পন্ন হবে বলে মনে করি। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

রোহিতপুর: ফিল্ম স্টাডি সেন্টার

মুহম্মদ খসরুর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন তার গ্রামের বাড়িতে একটি ফিল্ম স্টাডি সেন্টার নির্মাণ করবেন। তার সেই স্বপ্নের ফিল্ম স্টাডি সেন্টারটি (যেটা তিনি শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি) কি অবস্থায় আছে তা দেখার জন্য ৩রা ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আমি এবং হাবিব ওয়াহিদ তার পৈত্রিক বাড়ি কেরানীগঞ্জের রোহিতপুরে যাই। অবসর গ্রহণের পর থেকে অকৃতদার খসরু ভাই এখানেই থাকতেন। সখিনা নামের ষাটোর্ধ্ব বিধবা এবং নিঃসন্তান একজন মহিলা তার দেখভাল করতেন। পাশাপাশি তিনটি বাড়ি, মাঝখানেরটি মুহম্মদ খসরুর, তার দুপাশে দুই ভাইয়ের। সপ্তাহখানেক আগেও হাবিব ওয়াহিদ গিয়েছিলেন সেখানে। খসরু ভাইয়ের রুমগুলোতে তিনি ঢুকতে পারেননি, বইয়ের গাদাগাদি অবস্থা ও অপরিচ্ছন্নতার কারণে। আতিক নামে এক যুবক, যিনি সম্পর্কে খসরু ভাইয়ের নাতিন হন, তিনিই রুমের বইগুলোর যত্ন নেন। আমাদের যাওয়ার আগাম সংবাদ দিয়ে হাবিব ওয়াহিদ তাদের বলে রেখেছিলেন রুমগুলো পরিষ্কার করে রাখার জন্য।

চারদিকে বই আর বই আর বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন ও পত্রপত্রিকা। একটি কক্ষে বড়ো সাইজের দুটি বুকসেল্‌ফ অন্য দুটি কক্ষে বিছানা ও টেবিলের উপর রাখা গাদা গাদা বই। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত দেশি-বিদেশি বই ও পত্রিকার সংখ্যাই বেশি। যত্নের অভাবে অনেক বই ও পত্রপত্রিকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিছানার উপর রাখা অনেকগুলো ডায়েরি, বিভিন্ন সালের। অনেক ডায়েরিতে মুহম্মদ খসরু দিনলিপি লিখে গেছেন। কয়েকটি ডায়েরি কাজের স্বার্থে হাবিব ওয়াহিদ তালিকা করে খাতায় স্বাক্ষর করে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আতিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন। ডায়েরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে দিনলিপির একটি পাতায় চোখ আটকে গেল আমার। খসরু ভাইয়ের দিনলিপি থেকে জানা যায়, ফিল্ম স্টাডি সেন্টার তৈরির জন্য তিনি তার অংশের কিছু জমি বিক্রি করেছেন, পেনশনের টাকা ও জমি বিক্রির টাকা মিলিয়েও স্টাডি সেন্টারের জন্য দোতলা বিল্ডিং সম্পন্ন করা যাচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, কয়েকবছর আগেও এটি টিনের ঘর ছিল। ফিল্ম স্টাডি সেন্টার নির্মাণের জন্যই তিনি দোতলা বিল্ডিং করার উদ্যোগ নেন। খসরু ভাইয়ের ঘরের নাতিন আতিকের কাছ থেকে জানতে পারি, ২০১৭ সালে তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ফিল্ম স্টাডি সেন্টারের জন্য পনেরো লাখ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন খসরু ভাইকে। পরে ২০১৯ সালে আরও পনেরো লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হয়, যা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। আমার কাছে মনে হয়েছে, এই অজপাড়াগাঁয়ে ফিল্ম স্টাডি সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা খসরু ভাইয়ের ভুল পরিকল্পনা। যদিও ঢাকা থেকে রোহিতপুরে যেতে দেড়-দুই ঘণ্টা সময় লাগে, তারপরও আমার কাছে মনে হয়েছে, ঢাকা মেট্রোপলিটনের মধ্যে কোথাও ফিল্ম স্টাডি সেন্টার করলে চলচ্চিত্র জগতের সৃষ্টিশীল মানুষেরা উপকৃত হতো। পারিবারিক কূটকাচালি, দেনা-পাওনা, লাভক্ষতির হিসাবের প্যাঁচে এবং ভঙ্গুর চলচ্চিত্র সংসদের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে ফিল্ম স্টাডি সেন্টার কতটুকু সাফল্য পাবে, এমন প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রচুর দুর্লভ বই ও পত্রপত্রিকা অযত্নে-অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখনই উদ্যোগ না নিলে অচিরেই নীলক্ষেত বা পল্টনের ফুটপাতে সেগুলো দেখা যাবে। অবশ্য অনিসন্ধিৎসু পাঠক তাতে উপকৃত হবেন, কম দামে ফুটপাত থেকে বই কিনতে পারবেন। আমি অবশ্য আতিককে বলে *ধ্রুপদী*'র পঞ্চম সংখ্যার (প্রকাশকাল ১৯৮৫) কয়েকটি কপি থেকে পোকায় খাওয়া বেছে বেছে কিছুটা ভালো আছে এমন একটি কপি এবং সাজেদুল আওয়াল সম্পাদিত *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র* সংসদ আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ১৯৬৩-২০১৩ সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থটি আয়ত্ত করি। *ধ্রুপদী*'র প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যা অনেক খুঁজেও সন্ধান পাইনি, হয়ত পড়ে আছে কোনো এক কোণা-কাঞ্চিতে।

খসরু ভাইয়ের *নামহীন গোত্রহীন* চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের পাণ্ডুলিপি দেখালেন আতিক, খুবই করুণদশা। হাবিব ওয়াহিদ অনেক আগেই ফটোকপি করেছিলেন বলে রক্ষা, তা না হলে তিনি অনিন্দ্য'র এই সংখ্যায় চিত্রনাট্যটি ছাপতে পারতেন না। একটি সিনেমা বানানের জন্য খসরু ভাইয়ের মধ্যে যে উত্তেজনা আকুলতা দেখেছি, তা মনে পড়ে গেল। দুই রাজনৈতিক দলের ক্ষমতাকালীন তিনি হাসান আজিজুল হকের 'নামহীন গোত্রহীন' গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য করে অনুদানের জন্য জমা দিয়েছিলেন। রাজনীতির মারপ্যাঁচে এবং যাদেরকে তিনি হাতেকলমে চলচ্চিত্রপাঠ দিয়েছেন তাদের আন্তরিকতার অভাবে বারবার চিত্রনাট্য জমা দেওয়ার পরও তিনি সরকারি অনুদান পাননি। রাজেন তরফদার পরিচালিত *পালঙ্ক* সিনেমায় খসরু ভাই সহকারী পরিচালক ছিলেন। অনেক চলচ্চিত্রকর্মী মুহম্মদ খসরুর কাছ থেকে হাতেখড়ি গ্রহণ করে ভালো ভালো ছবি বানিয়েছেন, অনেকেই মনে করেন খসরু ভাইয়ের জীবনের বড়ো একটি ব্যর্থতা কোনো সিনেমার পরিচালক হতে পারলেন না তিনি। আমার কাছে মনে হয়, একটি সিনেমা না বানিয়েও মুহম্মদ খসরু বাংলাদেশের সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র জগতের একটি মিথ, যিনি কোনো সিনেমা না বানিয়েও অনেক সিনেমার জন্ম দিয়েছেন।

অনিকেত শামীম: সাহিত্যিক, সম্পাদক, লোক ও সরকারি চাকরিজীবী, loke.shamim@gmail.com

তথ্য সুরক্ষায় সরকারের কার্যক্রম

সুস্মিতা চৌধুরী

তথ্য সুরক্ষা দিবসটি ১৯৮১ সালে ইউরোপের বৃহৎ সংগঠন 'কাউন্সিল অব ইউরোপ' কনভেনশন ১০৮ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম উদ্‌যাপন শুরু হয়। 'কনভেনশন ১০৮' গোপনীয়তা ও তথ্য সুরক্ষা নিয়ে প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি যা প্রতিপালনের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ২৮শে জানুয়ারি ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স (এনসিএসএ)-এর নেতৃত্বে দিবসটি পালিত হয়। ইউরোপে উদ্‌যাপন শুরু হওয়া তথ্য সুরক্ষা দিবস ২০০৮ সাল থেকে উত্তর আমেরিকায় পালন শুরু হয়। এই দিবসটি মূলত ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভোক্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার সর্বোত্তম কলাকৌশল ভাগাভাগি করার সুযোগ করে দেয়। তথ্য সুরক্ষা দিবস বিশ্বব্যাপী একটি বৃহত্তর ক্যাম্পেইনের অংশ, যেখানে প্রাইভেসির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়। তুলে ধরা হয় ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার সহজ সব পদ্ধতি। পাশাপাশি সংগঠনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয় সব কাজে প্রাইভেসি অতি গুরুত্বপূর্ণ। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, করপোরেশন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা ও ব্যক্তি পর্যায়ে বাসাবাড়ি ও কর্মস্থলে সচেতনতা তৈরির ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক এই ক্যাম্পেইনে যুক্ত হয়েছে সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন। 'ডাটা প্রাইভেসি ডে'-এর মাধ্যমে প্রাইভেসি ও ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্তা প্রচার করা হয়। এর মধ্য দিয়ে তথ্য সুরক্ষা ও আস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সচেতনতা বিকাশের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে সংগঠনগুলো। ২০১৮ সালে এই কার্যক্রমের অফিসিয়াল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যালায়েন্সের (এনসিএসএ)-এর নির্বাহী পরিচালক মাইকেল কাইজার বলেন, ইন্টারনেট অব থিংসের (আইওটি) মতো প্রযুক্তিগত অগ্রসরতার আগামী প্রজন্মের জ্বালানি হলো আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং আমাদের অভ্যাস ও আগ্রহ। আইওটি বলতে আমাদের বাসাবাড়ি, স্কুল ও কর্মক্ষেত্র– সব জিনিসেই ইন্টারনেট ডিভাইসের সংযোগ থাকাকে বোঝায়। তাই কীভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা করা যায় ভোক্তাদের তা অবশ্যই শিখতে হবে। পাশাপাশি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ভোক্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য লেনদেনের পদ্ধতি ও তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কে তারা স্বচ্ছ।

মাইকেল কাইজার বলেন, ভবিষ্যতে সংযুক্ত প্রযুক্তির (ইন্টারনেট অব থিংস আইওটি) মাধ্যমে আমাদের জীবনযাপনের বিকাশ ঘটানোর অসাধারণ সুযোগ মিলবে। কিন্তু আমরা কেবল তখনই একটি অধিক নিরাপদ ও আস্থাশীল ইন্টারনেট ব্যবস্থা তৈরি করতে পারব যদি আমরা প্রত্যেকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করি।

কোভিড-১৯ মহামারির বিস্তার রোধে তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে নেওয়া হয় নানা পদক্ষেপ। এর অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী চালু হয় 'ডিজিটাল কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং' অ্যাপ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন রোগীর সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার কাজটি 'ডিজিটাল কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং' অ্যাপের মাধ্যমে করা হয়। এই অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্ক করা হয়। ২০২০ সালের ৪ঠা জুন বাংলাদেশেও স্মার্টফোন অ্যাপটি চালু করা হয়। এই পদ্ধতিতে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করে ভাইরাসের বিস্তার রোধে পদক্ষেপ নেওয়া ও অন্যদের সতর্ক করা হয়। যেমন: কেউ যদি আক্রান্তের কাছাকাছি চলে যায় তাহলে তাকে স্মার্টফোনে অ্যালার্ট করা হয়। তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা যদি কয়েকদিন পরও করোনা পজিটিভ হয় তাহলেও স্মার্টফোন থেকে সতর্ক বার্তা পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ফোন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেওয়া যায়। বিপুল সংখ্যক মানুষের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি করোনার বিস্তার রোধে ভূমিকা রাখে। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলো কোভিড-১৯ মোকাবিলায় তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। একইসঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তায় জাতিসংঘের সুরক্ষা নীতি' মেনে চলতে আহ্বান জানানো হয়।

শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য কোনো একক আইন নেই। তবে, কয়েকটি আইনে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার বিষয়ে বিধান রয়েছে। যেমন: ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) প্রণয়ন করা হয়েছে যার ২৬ ধারা অনুযায়ী আইনি কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কারও পরিচিতি তথ্য বা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, বিক্রয়, দখল, সরবরাহ বা ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী, কোনো ইলেকট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্ট্রার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তুতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়ে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত রেকর্ড, বই বা দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তু অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তবে যেহেতু আইন দুটি ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রণয়ন করা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যম ছাড়া কোনো অপরাধ এই আইনের অধীন বিচারযোগ্য নয়।

তথ্য সুরক্ষা আইন ব্যক্তির পক্ষে তার অধিকার সংরক্ষণে যেমন দায়িত্ব পালন করে, তেমন এর সঙ্গে আইন মেনে চলার জন্য জনসচেতনতাও প্রয়োজন আছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রচার ও প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কীভাবে বজায় থাকবে তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে– যা তথ্য সুরক্ষা আইনে ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনছে।

সুস্মিতা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বিশ্ব যুদ্ধজনিত অনাথ শিশু দিবস

ফাতেমা আক্তার

মা ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই অন্ধকার। বাবা ছাড়া কোনো ছায়াই আমাদের জন্য কল্যাণকর নয়। পৃথিবীতে একমাত্র নিস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারে মা-বাবাই। এই অভাব কেউ পূরণ করতে পারে না। এটা সেই বুঝে যার মা-বাবা নেই। সৃষ্টিকর্তার এই সুন্দর সৃষ্টির মাঝে মানবজাতির হিংসা-বিদ্বেষ আদিকাল থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তারই যেন এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফরাসি সংগঠন এসওএস এনফ্যান্টস এন ডিট্রেস (SOS Enfants en Detresse)-এর হাত ধরে প্রথম 'বিশ্ব যুদ্ধজনিত অনাথ শিশু দিবস' পালিত হয়। যুদ্ধজনিত কারণে অনাথ শিশুদের মানসিক সংকট ও দুর্দশা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এই সংকটজনিত সমস্যা থেকে তাদের মুক্তি ও সাধারণ শিশুদের মতো তারাও যেন শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সামাজিক মর্যাদা পায়, সে লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৬ই জানুয়ারি 'বিশ্ব যুদ্ধজনিত অনাথ শিশু দিবস' পালন করা হয়।

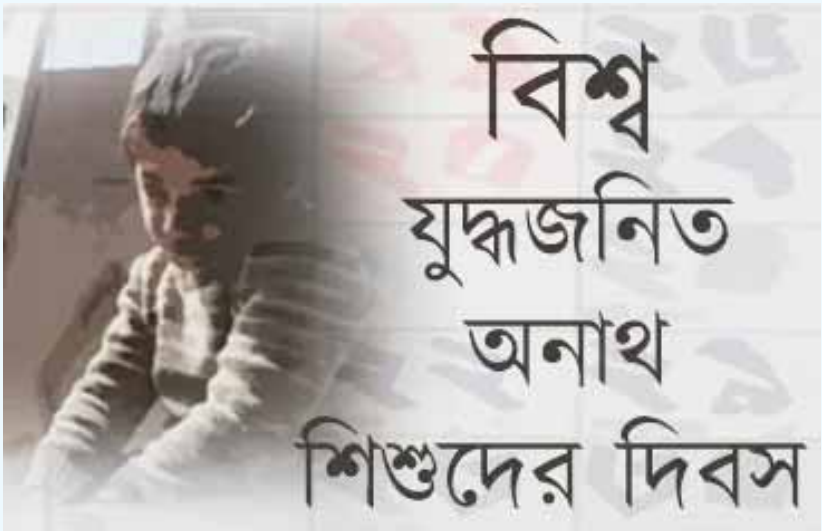

অনাথ শিশুর জীবন সব সময়ই দুঃখ আর কষ্টে ভরা। ইউনিসেফের মতে, অনাথ শিশু বলতে এমন একজন ১৮ বছরের কম বয়সি শিশুকে বোঝায়– যার মা অথ বা বাবা অথবা উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে অগণিত শিশুদের অনাথ হওয়া–একটি বিশ্বব্যাপী মানবিক ও সামাজিক সংকট, যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইউনিসেফের সমীক্ষা অনুযায়ী, পৃথিবীর উত্তর-পূর্বের দেশগুলোতে প্রায় ৯,০০,০০০ শিশু রয়েছে যারা সবাই যুদ্ধের কারণে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে এই অনাথ শিশুদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তবে সে দেশগুলোতে যুদ্ধ এবং এইডস-এর প্রকোপ রয়েছে, যেখানে অনাথ শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনিসেফ আরও বলছে, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে যেসব শিশুরা অনাথ হয়েছে, তাদের সিংহভাগই যুদ্ধের কারণে হয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিশ্বে যুদ্ধে অনাথ শিশুর সংখ্যা ধাপে ধাপে বেড়ে চলছিল। ১৪৬ মিলিয়ন থেকে তা এসে দাঁড়িয়েছিল ১৫১ মিলিয়ন। প্রতিবছরে ০.৭ শতাংশ করে যুদ্ধে অনাথ শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তবে এই হার খুবই কম–তাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সংস্থাটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি হিসেবে আমরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করতেই পারি। সেসময় অনাথ হয়েছে লাখ লাখ শিশু। চলমান ইরাক-কুয়েত-ফিলিস্তিনি-আফগানিস্তান ইউক্রেন-রাশিয়াসহ যুদ্ধসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশগুলোতে অনাথের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অমানবিক হত্যা এবং বর্তমান করোনা মহামারিতে অনাথের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধের সময় যে শুধু বড়োরা কষ্ট করে এমনটা নয়। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে শিশুরাও। যাদের মা-বাবা নেই, তাদের যুদ্ধাবস্থায় সবচেয়ে বেশি খাদ্যের জন্য কষ্ট করতে হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় শুধু শিশুরাই নয়, সব মানুষেরই চিকিৎসার অভাব ছিল। তারা চিকিৎসার জন্য ঘুরে বেড়াতো বিভিন্ন হাসপাতালে। কিন্তু প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেত না। যেখানে সাধারণ মানুষই তাদের চিকিৎসা পায়নি, সেখানে অনাথ শিশুরা কীভাবে তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাবে। চিকিৎসার অভাবে অনেক শিশু মারা গেছে। অনেক শিশু ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

রোদের তাপ কিংবা ঝড়-বৃষ্টি–যাই হোক না কেন, সুস্থভাবে বাঁচার জন্য বাসস্থান খুবই প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধাবস্থার কারণে নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে পড়ে বড়োদের পাশাপাশি শিশুরাও। মূলত বিশ্বযুদ্ধকে ঘিরে অনাথ শিশুদের করুণ কাহিনি মনে রাখার জন্য বিশ্বব্যাপী পালিত হয় বিশ্ব যুদ্ধজনিত অনাথ শিশু দিবস। এ দিবসটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মর্মান্তিক এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে শিশুদের যত্ন নেওয়া একটি বিশেষ অগ্রাধিকার। যুদ্ধের কারণে এই অনাথ শিশুদের যুদ্ধ সংক্রান্ত মানসিক ক্ষত সারাতে এবং একইসঙ্গে পড়াশোনাসহ স্বাভাবিক জীবন শুরু করতে সাহায্য করার জন্য তাদের প্রতি সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়া সকলের দায়িত্ব। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সংবিধানে অনাথ শিশুদের সুরক্ষা ও ন্যায্য অধিকার যেন পায় সেলক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি, জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক দশকে সশস্ত্র সংঘর্ষে সাধারণ মানুষের হতাহতের অনুপাত উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং হতাহতের প্রায় অর্ধেকের বেশি শিশু। যুদ্ধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে প্রায় দুই কোটি শিশু হয় তাদের বাসস্থান হারিয়েছে অথবা বাসস্থান ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। তাই আসুন, এসব যুদ্ধ অনাথ শিশুদের সার্বিক সহযোগিতায় সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করি। যুদ্ধ পরিহার করি।

ফাতেমা আক্তার: প্রাবন্ধিক

সমন্বিত সামাজিক সেবা ও উন্নয়নে সরকার

অনিল কুমার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যতম। এ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর দেশের দুস্থ, দরিদ্র, এতিম, বয়স্ক, বিধবা, বিপন্ন শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কল্যাণ, অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদফতরের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস।

১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের পরামর্শে সমাজকল্যাণ কার্যক্রম শুরু হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর। পরবর্তীতে কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃতির কারণে ১৯৭৮ সালে এই পরিদপ্তরকে সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয় এবং ১৯৮৪ সালে একে সমাজসেবা অধিদফতর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের সদরদপ্তর ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ২রা জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকায় সমাজসেবা অধিদফতরে জাতীয় সমাজসেবা ও জাতীয় মানবকল্যাণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এসময় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের আলোকে দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে সরকারের অভিপ্রায় বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে এ অধিদফতর পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতাসহ প্রান্তিক মানুষের জন্য বিভিন্ন ভাতা চালু করে বর্তমান সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝুঁকি মোকাবিলা কর্মসূচি ইত্যাদি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এ অধিদফতরের ভূমিকা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। বর্তমান সরকারের সময়ে এ পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

সমাজসেবা অধিদফতর বর্তমানে ১০৩২টি কার্যালয়ের মাধ্যমে ৫৪টি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে– দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি, শিশু সুরক্ষামূলক কার্যক্রম, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধিতা সহায়ক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র, সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি। এসব প্রত্যেকটি কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রণয়ন করেছে সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা জানুয়ারিকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' ঘোষণা করেন। ৪ঠা জুন ২০১২ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে জানুয়ারি মাসের ২ তারিখকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' ঘোষণাপূর্বক দিবসটিকে 'খ' ক্যাটাগরি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। এ বছর জাতীয় সমাজসেবা দিবসের প্রতিপাদ্য– 'উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দেশ গড়বো সমাজসেবায়।'

প্রতিবছর 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করেন। এ বছর বাণীতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দুস্থ ও অসহায় মানুষের উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম প্রচলন করে তিনি দেশে ও সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার প্রতিবন্ধী, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় জি-টু-পি পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন কৌশলগত সংস্কার কর্মসূচি বিশ্বের কাছে দেশকে কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অসহায়, অনগ্রসর মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরে ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য দেশ পুনর্গঠনের শুরুতেই সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদানসহ সুদূরপ্রসারী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্র শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। শিশুদের সুরক্ষায় প্রণয়ন করেন শিশু আইন ১৯৭৪।

খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. শহিদুল ইসলাম জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩-এর উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, অনাথ প্রতিবন্ধী, কিশোর-কিশোরী, স্বামী নিগৃহিতা নারী ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গসহ সহায়-সম্বলহীন মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে লাগসই ও টেকসই প্রকল্প গ্রহণসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ৫৪টি জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ১ কোটি ৮ লক্ষ জন উপকারভোগীর ভাতা ও অনুদানের টাকা সরাসরি দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জি-টু-পি পদ্ধতিতে।

তিনি আরও বলেন, আমরা চা-শ্রমিক, হিজড়া, বেদে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করছি। ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগী এমনকি অগ্নিদগ্ধদের জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছে। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিসহ ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্যও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। শিশু সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮ সেবা প্রচলন করা হয়।

এছাড়া জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বিশ্বাস করি, দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনতে ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমাজসেবা অধিদফতর বদ্ধপরিকর এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সদা তৎপর থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশকে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

সমাজসেবা অধিদফতর জাতিসংঘসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ বা কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, শিশু অধিকার সনদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ইত্যাদি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। প্রথমদিকে কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি (Welfare Approach) নিয়ে কাজ করলেও বর্তমানে এ অধিদফতর অধিকার ও ক্ষমতায়ন দৃষ্টিভঙ্গি (Right Based and Empowerment Approach) নিয়ে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

এছাড়া এ অধিদফতরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সেবার হাত সম্প্রসারিত করছে এবং স্থাপন করছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সহায়তা) অনুপম দৃষ্টান্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন দিবস ও বছর উদ্‌যাপনের মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনায় এ অধিদফতরের রয়েছে সার্থক প্রয়াস।

দুস্থ, অসহায়, প্রতিবন্ধী, বিপন্ন শিশু ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদফতর। এ অধিদফতরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মূলধারার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদফতর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদফতর এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একইসাথে নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

অনিল কুমার: প্রাবন্ধিক

মিশন বাংলাদেশ

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

সোহেল রহমান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সহকারী সচিব হিসেবে যোগ দিয়েছে পাঁচ মাসও হয়নি। কাঙ্ক্ষিত মন্ত্রণালয়ে যোগ দিতে পেরে সে মহা খুশি। সিনিয়রদের কাছে কাজ শেখা, তাদের ভালো দিকগুলো ফলো করা, তাদের কাছে নিজেকে যোগ্য অফিসার হিসেবে প্রমাণ করার জন্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে নিজেকে উপস্থাপন করে ইতোমধ্যে দু'চারজনের সুনজরে পড়েছে।

অফিসের গাড়ি তার ফ্ল্যাটের দরজায় আসে না। বড়ো রাস্তায় দাঁড়াতে হয়। তার জন্য অন্য কলিগরা বিরক্ত হোক সে তা চায় না। প্রতিদিনের মতো আজও সে পাঁচ মিনিট আগে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। নীচ থেকে উপরে উঠে আসছেন প্রতিবেশী বড়ো ভাইয়ের কলিগ আলী ভাই।

সোহেল আলী ভাইকে পছন্দ করে না। সব সময় অ্যাভয়েড করতে চায়। আলী ভাই মনে করেন বাংলাদেশ স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র নয়। ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য। সিকিমের মতো। সময় সুযোগ বুঝে ভুটান-বাংলাদেশ সব গিলে খাবে। বঙ্গবন্ধুকে প্রতিদিন বকা দিতে না পারলে তার সুখনিদ্রা হয় না ।

আলী ভাইয়ের পাশ কাটিয়ে সোহেল না দেখার ভান করে নেমে আসছে , আলী ভাই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, অফিস যাচ্ছো ? যেতে হবে না। আজ ছুটি।

তার মানে! কিসের ছুটি?

তুমি দেখছি কিছুই জানো না। শেখ সাহেব নেই।

নেই মানে?

নেই মানে খতম। সপরিবার সব খতম। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। আর্মিরা এটা ভালো করেই জানে। দেশের বাইরে ছিল তাই মেয়ে দুইটা বেঁচে গেল।

সোহেল ভয়ংকর ক্রোধে নিঃশব্দ চিৎকারে কুৎসিত বকা দিলো, বাস্টার্ড। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে তার অফিস গাড়ির স্টপেজে এসে দাঁড়াল। সোহেলের মনে হলো আলী ভাই তাকে নির্মম যাতনা দিয়ে কুৎসিত আনন্দ উপভোগ করছে। আসলে এসব কিছু ঘটেনি।

দিনটি আজ অস্বাভাবিক। পথঘাট জনশূন্য। লোকজন, গাড়ি, বাস-ট্রাকের অভাবে বড়ো রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। পাশ দিয়ে এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক বাজারের থলে হাতে ত্রস্তে হেঁটে যাচ্ছেন। সোহেলকে অফিস ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কারফিউ দিয়েছে। মার্শাল'ল ঘোষণা করেছে! এই ছিল কপালে ! রাস্তায় বেরুনো ঠিক না। যে-কোনো সময় বিপদ হতে পারে। ঘরে ফিরে যান।

সোহেলের কেমন এলোমেলো লাগছে। দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। কোথাও কোনো ভুল হয়নি তো? বদলোকের কোনো গুজব? স্বাধীনতার নায়ক, ২৩ বছরের জেল-জুলুম অত্যাচার সয়ে মানুষের অন্তরে গড়ে তুলেছেন স্বাধীনতার স্বপ্ন। পাকিস্তান, আমেরিকা, চীন বৃহৎ এই ত্রয়ী শক্তি যে স্বাধীনতা আটকাতে পারল না। বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির মঞ্চে তুলেও সসম্মানে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হলো। কী এমন ঘটল, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সপরিবার হত্যা করা হলো?

সোহেল ক্লান্ত বিধ্বস্ত পরাজিত। নত মাথায় ঘরে ফিরে এলো। মৃত্যু বঙ্গবন্ধুর হয়নি, তাঁর হয়েছে। যদি এমন হতো! পৃথিবীতে কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে, এমন কি ঘটতে পারে না বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছে। যা শুনেছে তা নেহাতই গল্প।

বেদনা আরও তীক্ষ্ণ নির্মম, হারিকুরির মতো হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয় যখন শুনি বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান নয়, আমেরিকা নয়, চীন নয়, হত্যা করেছে ঘরের শত্রু বিভীষণ। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা মুক্তিযোদ্ধার গ্রুপটি। এরা কি মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে পাকিস্তানি প্রশিক্ষিত গুপ্তচর? তাদের মিশন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশকে পাকিস্তানি কনফেডারেশনে বন্দি করা? সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি স্তরে স্তরে গোপন ষড়যন্ত্র। পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যদের সারেন্ডারের মুহূর্তে পাকিস্তানি

এজেন্ট আলবদর-রাজাকার দিয়ে বুদ্ধিজীবী নিধন। বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য, পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এমনি কত ষড়যন্ত্রের স্তর সাজানো আছে কে জানে!

দুপুরে ভাত খেতে গিয়ে সোহেল অনুভব করল সে খেতে পারছে না। ভাত গলা দিয়ে নামছে না। মনে হয় বমি করে ফেলবে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, না খেয়ে উঠে পড়লি যে?

সোহেল কোনো কথা না বলে হাত ধুয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। কপালে ঠান্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে সোহেল ফিরে তাকালো।

কী হয়েছে?

ভালো লাগছে না। বমি বমি লাগছে। মনে হয় জ্বর-টর হবে হয়ত।

মা বললেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হয়েছে, তা নিদারুণ কষ্টের। মেনে নেওয়া যায় না। তুই সরকারি কর্মকর্তা। দলীয় লোক না। কষ্টটা অন্তরে থাক। বাইরে এর কোনো প্রকাশ এ মুহূর্তে ঠিক না। ধৈর্য ধরতে হবে। মনকে শক্ত রাখতে হবে।

খোন্দকার মোশতাককে সামনে রেখে খুনি মেজররা দেশ শাসনের চেষ্টা করতে লাগল। তারপর খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান। আওয়ামী লীগরা চাঙা হয়ে উঠল। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী চার জাতীয় নেতাকে জেলখানায় হত্যা করে খুনি মেজররা দেশ ছেড়ে পালালো। সব যেন সাজানো নাটকের অভিনয় চলছে। এরপর ক্ষমতার মঞ্চে এল নাটকের নায়ক তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়া। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তিন মাস ধরে চলল হত্যা, ক্ষমতা দখল, পালটা দখলের হানাহানি। রাজনীতি চলে গেল বন্দুকের নলের দখলে। মাস্তানদের বাহুবলের অধীনে।

সোহেল এক কঠিন সমস্যায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বাংলাদেশে এই দমবন্ধ পরিবেশে থাকতে তার ইচ্ছে করে না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পালাতে পারলে বাঁচে। কোথায় পালাবে? কেন পালাব? পালানোর অর্থ কি মুক্তি? সে কি পালিয়ে একা বাঁচতে চায়?

মুক্তিযুদ্ধের সময় তার অনেক বন্ধু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। কেউ শহিদ হয়েছে, কেউ বিজয়ী আনন্দে ফিরেছে। তখন তার যুদ্ধে যাবার সময়। বেঁচে থাকার জন্য সে নানা জায়গায় পালিয়ে বেরিয়েছে। আজও সে পালিয়ে বাঁচতে চায়? যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস তার নেই।

মৃত্তিকা সোহেলের প্রেমিকা। উভয় পরিবারের ইচ্ছে খুব শিগ্‌গির তাদের বিয়েটা হয়ে যাক। বঙ্গবন্ধুর হত্যার ঘটনা না ঘটলে এতদিনে তারা বরবধূ হয়ে বসতি করত।

মৃত্তিকা রহস্য করে জিজ্ঞেস করল, কীরে মাথা নিচু করে আসিছ কেন? অন্য কোনো সুন্দরী তোর মনে ছায়া ফেলেনি তো? এখন তুই ফরেন মিনিস্ট্রির স্মার্ট অফিসার। কোনো ভয় নেই, আমি কখনো তোর স্বপ্নের বাধা হব না। তোর সুখের জন্য নীরবে পথ ছেড়ে দেওয়ার সাহস আমার আছে।

সোহেল মৃত্তিকার দিকে মুখ তুলে তাকালো। চোখে জল টলমল।

ওমা, এ কী! পুরুষ মানুষ কখনো কাঁদে? আশঙ্কায় ভালোবাসায় থরো-থরো কম্পিত মৃত্তিকা সোহেলের বেদনা তাঁর বুকে আঁকড়ে ধরে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, সোনা?

সোহেল মৃত্তিকার কম্পিত বুক থেকে তার চোখের দিকে মুখ তুলে তাকালো। ফিসফিস করে বলল, ভয়।

কীসের ভয়?

জানি না ।

তোর বাবা-মা, ভাইয়া-ভাবি সকলে আছে। আমি একা। তোকে একা রাখতে আমার ভয় করছে। বিয়ের তারিখ এগিয়ে আনি। বাবাকে বলি আগামী রোববার আমাদের বিয়ের আয়োজন করতে। প্লিজ, তুই না করিস না।

আগামী রোববার আমাকে দেশ ছাড়তে হবে।

তার মানে! মৃত্তিকা বিস্মিত। কেন?

আমাকে কানাডায় বাংলাদেশ এমবাসিতে ট্রান্সফার করেছে। আগামী রোববার ফ্লাইট।

মৃত্তিকা জেদি গলায় বলল, তোকে একা ছাড়ব না। আমরা আজই বিয়ে করব।

সোহেল মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মৃদু গলায় বলল, কানাডায় গিয়ে চাকরিতে জয়েন করেই বিয়ের ছুটি নিয়ে চলে আসব। স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারপর দুজন একসঙ্গে ফিরে যাব।

মৃত্তিকা সোহেলের বুকে মাথা রেখে আষাঢ়ের মেঘের মতো মুষলধারে কাঁদতে লাগল। মৃত্তিকার চোখের জল সোহেলের জামা ভিজে তার বুক ভিজছে। সোহেল আবেগতাড়িত হলো না। সোহেলের কঠিন বুক বেয়ে মৃত্তিকার নোনাজল গড়িয়ে পরতে লাগল, যা সোহেলের হৃদয় স্পর্শ করতে পারল না।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের স্বাভাবিক বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু না হলে বিশ্বে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা কলঙ্কিত হবে। সামরিক সরকারের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুসহ সপরিবার হত্যাকারীদের দেশের কোনো আদালতে এখন কিংবা পরে বিচারের আওতায় আনা যাবে না। এই বিষয়ে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন এবং চাকরিতে খুনিদের পদোন্নতি, নানাবিধ পুরস্কার, সুযোগ-সুবিধা ও সম্মান জানাতে লাগল। যেন তারা জাতীয় বীর। গর্ভবতী নারী, শিশু, নবদম্পতিসহ সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে মহান বীরের কাজ করেছে। বঙ্গভবনের চার দেয়ালের মধ্যে এই বীরদের যত আস্ফালন। দেশের জনগণের সঙ্গে মিশার সাহস তাদের হলো না।

এক বছর পার হতে চলল সোহেলের বিয়ের ছুটি নিয়ে ঢাকায় ফেরা হলো না। মৃত্তিকার সঙ্গে যোগাযোগ দিনে-দিনে কমে আসছে। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগও তেমনি। তাঁদের ফোন ধরা ছেড়ে দিয়েছে। সোহেল নিজ থেকে ফোন করে না। মৃত্তিকা পাগলের মতো ফোন করে যায়। দশবার ফোন করলে সোহেল হয়ত একবার ফোন ধরে। কোনো আবেগ নেই, দুঃখ নেই, যন্ত্রের মতো ফোন ধরে। শুধু কথা শোনে। কোন উত্তর দিতে, কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

মৃত্তিকা কান্নাকাটি করে। আর সহ্য করতে পারছে না। অবশেষে মৃত্তিকা তার সিদ্ধান্ত জানালো, সে কানাডায় আসছে– সে কথা সোহেলকে জানিয়ে দিলো।

সোহেল বেদনার সঙ্গে বলল, মৃত্তিকা, তুই খুব ভালো মেয়ে। তোর সঙ্গে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখেছি। আমি এখন পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না। আমি এখন আগের মতো নেই। ভিন্ন অচেনা পথে চলি। তোকে, বাবা-মা, ভাই-ভাবি, তোদের কাউকে চিনতে পারি না। তুই নিজের মতো করে তোর পথ খুঁজে নিস।

মৃত্তিকা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, পনেরো দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আমার টিকিট, ভিসা সব রেডি। তোমাকে দেখার, কথা বলার সুযোগ দিও, প্লিজ। তারপর তোমার যা ইচ্ছে সিদ্ধান্ত নিও। আমি কোনো বাধা দেব না।

সোহেল লাইন কেটে দিলো। একমাস হতে চলেছে বঙ্গবন্ধুর এক খুনিকে কানাডা বাংলাদেশ দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিব পদে চাকরি দিয়ে পাঠিয়েছে। এখানে চাকরি করা আর সম্ভব নয়। তার যে লক্ষ্য কানাডা সে জায়গা নয়। লন্ডন হলো উপযুক্ত স্থান। সোহেল লন্ডনের

একটি ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করেছিল, সে সুযোগ পেয়েছে। মৃত্তিকা আসার আগে তাকে কানাডা ছাড়তে হবে।

পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে। সোহেলের পিএইচডি প্রোগ্রামের বিষয় 'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সেনা অভ্যুত্থানের কারণ'। সোহেল বিয়ে করেনি। বাংলাদেশের কারোর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখে না। তার ফোন নাম্বার কাউকে দেয়নি। লন্ডনের দু'তিনজন শুধু জানে। এদের একজন লন্ডনের বিখ্যাত সুলতান রেস্তোরাঁর মালিক, বঙ্গবন্ধু অন্তঃপ্রাণ বেলাল চৌধুরী। সোহেলের স্থানীয় অভিভাবক বেলাল সাহেব। তার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ। এরই পরিকল্পনা তৈরি করা, সম্ভাবনা যাচাই ও প্রয়োগ নিয়ে সে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে।

সোহেল সুলতান রেস্তোরাঁয় কাজ করে। রেস্তোঁরার মালিক ধনী সিলেটি ব্যবসায়ী বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত এক সখ্যতা গড়ে উঠেছে। স্বভাবে, আচরণে, শিক্ষায়, বয়সে তাদের কোনো মিল নেই। দুটি কারণে বন্ধুত্ব হতে পারে। বেলাল চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার চেয়ে প্রতিদিন ৩০ রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে। বেলাল চৌধুরীর বিবাহযোগ্য একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। এ বিষয়ে সরাসরি কোনো কথা না বললেও দু'একবার আকার-ইঙ্গিতে জানিয়েছে কোনো উচ্চ শিক্ষিত ছেলের কাছে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। মেয়েটি যে সোহেলের প্রতি আগ্রহী সোহেল তা বুঝতে পারে।

রেস্তোরাঁর কাজ শেষ করে মাঝে মাঝে অনেক রাত পর্যন্ত বেলাল চৌধুরী সোহেলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করে। সোহেল একদিন বলল, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে কী দিয়ে ?

অস্ত্র দিয়ে।

প্রতিশোধও নিতে হবে অস্ত্র দিয়ে। খুনের বদলে খুন।

বেলাল চৌধুরী নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কোনো পথের সন্ধান পেয়েছ?

পেলে আপনাকে জানাবো। সে যে অনেক টাকার দরকার। টাকাই মূল সমস্যা। টাকা থাকলে অনেক পথ খুলে যায়। এত টাকা কোথায় পাব?

টাকার চিন্তা তুমি করো না। টাকার চিন্তা আমার। বঙ্গবন্ধুরে জান দিয়ে ভালোবাসে এমন হাজার হাজার মানুষ আমার সিলেটি গোষ্ঠীতে আছে। একেকজন পাঁচ হাজার পাউন্ড করে দেয় তাহলে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড হবে। আমার জীবনের সব উপার্জন দিয়ে দিব।

এ বিষয়ে কারো সঙ্গে কোনো আলাপ করবেন না। আমি, আপনি ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে।

অফিস পাড়ায় বেলাল চৌধুরীর রেস্তোরাঁ সুলতানের সুনাম আছে। লাঞ্চের সময় এত ভিড় হয় যে খাবারের জন্য লাইনে অপেক্ষা করতে হয়। এই পিক আওয়ারে কোণার টেবিলে গোলমাল বেধে গেল। সুঠাম স্বাস্থ্যের প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা ৪০/৪৫ বয়সের এক ভদ্রলোক খাবারের বিল মিটাতে মানিব্যাগ খুঁজে হয়রান। সে খুব বিব্রত। মানিব্যাগ মিসিং হয়েছে। ম্যানেজার পুলিশে কল করতে চাচ্ছে। ভদ্রলোক করুণ মুখে মিনতি করছে, বিশ্বাস করো, আগামীকাল খেতে এসে বিল মিটিয়ে দেব। এ অবস্থায় সোহেল ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসল। আশ্বাস দিয়ে বলল, তোমার বিব্রত হবার কোনো কারণ নেই। এমনটা হতেই পারে। আমি সোহেল, ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডে পিএইচডি প্রোগ্রামের স্টুডেন্ট। আমি এখানে পার্টটাইম কাজ করি। তুমি?

লোকটি হাত বাড়িয়ে বলল, আমি পিটার, ইউকে আর্মির এক্স সোলজার। সিগন্যাল এক্সপার্ট। চাকরি শেষ। এখন বেকার। চাকরি খুঁজছি।

সোহেল বলল, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমরা কি বন্ধু হতে পারি?

পিটার হাত বাড়িয়ে বলল, আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমাদের বন্ধুত্বের সেলিব্রেট হোক আমার পক্ষ থেকে। কী ড্রিংকস পছন্দ ?

আজ যে ঠান্ডা , ভদকা হলে মন্দ হয় না।

সোহেল বলল, আমার রেস্তোঁরায় আসবে। বন্ধু হিসেবে তোমার জন্য সবসময় একটা ড্রিংক ফ্রি অফার পাবে। তোমার সঙ্গে আমার বার বার দেখা হোক সেটা আমার ইচ্ছে।

ছ'মাসের মধ্যে পিটারের সঙ্গে সোহেলের বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হলো। পিটার বিনয়ী-ভদ্র-কৃতজ্ঞ এবং বন্ধুত্বকে সম্মান করে। প্রতি সপ্তাহে সোহেলের সঙ্গে একবার করে দেখা হয়। আড্ডা হয়। এতদিনের পর্যবেক্ষণে সোহেলের মনে হয়েছে পিটারকে বিশ্বাস করা যায়।

সোহেল বলল, পিটার, আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে।

কী রকম সাহায্য ? পিটার হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, আমার কাছে টাকাপয়সা ধার চাইবে না তো ?

সোহেল মৃদু হেসে বলল, টাকা চাইব না, অন্যকিছু চাইব।

বলে ফেল ।

জানোতো আমার থিসিসের বিষয় হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব মানে এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ ও প্রতিকার বিষয়গুলো চিহ্নিত করা। মিডিয়া ও বিভিন্ন গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে জানা যায়, অনেক সময় ভাড়াটিয়া সৈন্যরা এইসব অভ্যুত্থানে জড়িত থাকে। কোনো পক্ষের হয়ে টাকার বিনিময়ে তারা কাজ করে। এইসব ভাড়াটে দু'তিনজন সৈন্যের ইন্টারভিউ আমার থিসিসের জন্য খুব প্রয়োজন। এই কাজটি না হওয়ায় আমি থিসিস সাবমিট করতে পারছি না। আমার এতদিনের পরিশ্রম স্বপ্ন ব্যর্থ হতে চলেছে। তুমি কি এ ব্যাপারে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে? তুমি কাজটাকে আপাতত পার্টটাইম জব হিসেবে নিতে পারো। বেকার সময়টাকে কাজে লাগাও। বন্ধুর উপকার করো। মান্থলি ফোর থাউজ্যান্ড পাউন্ড। প্লাস ট্রাভেল অ্যালাউন্স এক হাজার পাউন্ড স্টারলিং। চলবে?

চলবে। কতদূর সফল হতে পারব জানি না। তোমার স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করব। আশা করছি এক মাসের মধ্যে কিছু তথ্য তোমাকে দিতে পারব। আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ডের সূত্রে শুনেছি তার এক আত্মীয় আফ্রিকার কোনো এক রাষ্ট্রে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে দেশে ফিরেছে। ওদের মধ্যে অদ্ভুত এক কুসংস্কার আছে, যে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসেবে একবার যায় সে দ্বিতীয়বার যায় না। হতে পারে একবার গিয়ে সে এত টাকা আয় করে দ্বিতীয়বার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

দুমাস হয় পিটারের সঙ্গে সোহেলের দেখা নেই। সোহেল ফোনে যোগাযোগ, কথা বলা বন্ধ রেখেছে। প্রতিদিনই মনে হয় আজ হয়ত পিটার আসবে। কিছু আশাবাদী তথ্য পাবে। যে সূত্র ধরে সে তার পরিকল্পনা সাজাতে পারবে। যত দিন যাচ্ছে সে অস্থির হচ্ছে। হতাশা বাড়ছে। এক দুপুরে ইউনিভার্সিটি থেকে হোটেলের কাজে ফিরে দেখে পিটার লাঞ্চ করছে। পিটার ক্ষমা চেয়ে বলল, এত ক্ষিধে পেয়েছে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি।

সোহেল চাপা উত্তেজনায় চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, রেজাল্ট ?

পিটার চারপাশে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, পজেটিভ ।

সোহেল পিটারকে তার বাসায় নিয়ে এল। পিটার বলল, প্রতিটি ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, কাজের ধরন, কোথায়, কখন তাদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কোন সময় তাদের মেজাজ ভালো থাকে, কথা বলার সুযোগ পেতে পারো– এসব তথ্য যাচাইবাছাই করে খোঁজখবর নিয়ে তোমার সহায়ক প্রোগ্রাম তৈরি করেছি।

প্রথমত তুমি কোনো ক্যামেরা নেবে না। সাংবাদিকদের মতো কথা বলবে না। স্মার্ট বা ওভার স্মার্ট দেখাবে না। কোনো চালাকি ধরা পড়লে সোজা হাসপাতালে চালান হয়ে যাবে। তুমি একজন মহান যোদ্ধার কাছে যাচ্ছ। তুমি বোকাসোকা গরিব ছাত্র, তার সাহায্য না পেলে তুমি পাস করতে পারবে না। তোমার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে। এ ভাবটা বজায় রেখে তার মন ভেজাতে হবে।

ঘণ্টা হিসাবে তারা ফি দাবি করতে পারে , তা তোমাকে দিতে হবে। কারোর বাসার ঠিকানায় তুমি খোঁজখবর করবে না, যাবে না। তাদের কখন, কোথায় খোঁজখবর করবে তার সম্ভাবনাময় দিক নির্দেশনা তোমার জন্য তৈরি করেছি। তুমি যে গিয়েই তাদের দেখা পেয়ে যাবে, সে তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা করবে– এমনটা আশা করো না। এমনও হতে পারে দিনের পর দিন তুমি অপেক্ষা করলে কিন্তু সে তোমার সঙ্গে কথা বলল না। মারধর করে তাড়িয়ে দিলো। যদি সফল হতে চাও ধৈর্য, অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে।

ব্যক্তি নং-১: টমাস মরিসন, হাইট ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি। বয়স ৫২ থেকে ৫৪, ওজন ৯২ কেজি। চারটি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। দুটি যুদ্ধ করেছে দেশের জন্য সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন। বাকি দুটি যুদ্ধ করেছে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসেবে। তার সব মিশন সফল। হেলিকপ্টার চালনা থেকে আধুনিক সবধরনের সামরিক অস্ত্রের ব্যবহারে সে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ। সাহসী, কৌশলী, পরিস্থিতি বুঝে ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতায় কোনো যুদ্ধে সে পরাজয় হয়নি। সাহসী পদক্ষেপ ও যুদ্ধ জয়ের বীরত্বের জন্য এত পদক পেয়েছে যে বার বার স্যালুট দিতে ইচ্ছে করে। সে প্যারাট্রুপার ও গেরিলা বিশেষজ্ঞ। তার দুর্বলতা: দামি মদ, জুয়া, সুন্দরী নারী। ভালো দিক: তিনজনের মধ্যে একমাত্র সেই দুবার ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ সে কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়। সে বিবেকবান মানুষ। যত টাকাই দেওয়া হোক না কেন সে অন্যায়ের পক্ষে কাজ করে না। তার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে রয়াল ক্যাসিনো, ব্লুবার্ড, কিংবা ব্ল্যাকহোল বার। এই তিনটি বারই তার বাড়ির কাছাকাছি। দশ থেকে পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে। টমাস বললে দশজন টমাস এসে দাঁড়াবে। তোমাকে বলতে হবে বিগবস। বার জুয়ার আড্ডায় সকলে তাকে এ নামে চেনে।

পিটার একটি ম্যাপ মেলে বলল, এখানে টমাসের বাড়ির ঠিকানা, লোকেশনসহ বার তিনটির লোকেশন এবং ২নং ও ৩নং ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য দেওয়া আছে।

সোহেল বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি দারুণ কাজ করেছ। আমার পিএইচডি ফেল।

পিটার বলল, আমার প্রফেশন অনুযায়ী কাজটি করেছি। তুমি খুশি হওয়াতে আমার ভালো লাগছে।

দুই

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সোহেল নাট্যগ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে ছোটোখাটো চরিত্রে অভিনয় করত, কিন্তু তার আগ্রহ ছিল মেকআপের প্রতি। সামান্য পরিবর্তনে একজন মানুষের চেহারা আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। নিজেকে নিজের কাছে অচেনা মনে হয়। মেকআপের কোর্স করে সে হয়ে উঠল তার নাট্যগ্রুপের মেকআপ ম্যান। একদিন মেকআপ নিয়ে সোহেল বাসায় ফিরল। ডোরবেল বাজিয়ে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে রইল। ওর ছোটো বোন দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, কাকে চান?

সোহেল জিজ্ঞেস করল, সোহেল আছে?

বোন বলল, ভাইয়া ভার্সিটি থেকে এখনো ফেরেনি। ভাইয়াকে কিছু বলতে হবে?

মুখ থেকে মেকআপ খুলতে খুলতে সোহেল বলল, বলবেন সোহেলের খোঁজে সোহেল এসেছিল।

বোন বিস্মিত! আর সে কী হাসাহাসি। বোন তাকে চিনতে পারেনি। নিজের প্রতি সোহেলের আস্থা বেড়ে যায়। দাড়ি-গোঁফ রাখা এখন ফ্যাশন। তাছাড়া চেহারা লুকাতে সাহায্য করে। সোহেল ইনোসেন্ট ছাত্রের ছদ্মবেশ নিলো। সরল-সহজ, ইন্টেলেকচুয়ালদের মতো চুল ও পোশাক কিছুটা এলোমেলো। থিসিস বিষয়ে দুটি বই ও তার থিসিস পেপারের জেরক্স কপি, নোটবুক কলম নিয়ে রওনা দিলো। এর আগে একদিন দিনের বেলায় বার তিনটি রেকি করে এসেছে। রাত দশটায় সে রয়াল ক্যাসিনোতে প্রবেশ করল। তার মতো নিরীহ ছাত্র সাধারণত ক্যাসিনোতে আসে না। এককোণে খালি টেবিল দেখে সে বসল। বোকার মতো ইতিউতি তাকাতে লাগল। একজন রূপবতী ওয়েট্রেস কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, বলুন স্যার, আপনার জন্য কী করতে পারি।

সোহেল একটা ড্রিংকসের অর্ডার দিলো। ড্রিংকস সার্ভ করে ওয়েট্রেস জিজ্ঞেস করল, স্যারের কি আর কোনো সার্ভিস লাগবে ?

সোহেল নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, বিগবস কি আজ এসেছেন ?

ওয়েট্রেস কোনো উত্তর না দিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, সোহেল পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট বের করল।

এসেছেন। তার রুমে গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে আছে। এক ঘণ্টার আগে দেখা হবে না।

সোহেল তার সৌভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো। প্রথম দিনেই দেখা হতে যাচ্ছে। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, দেড় ঘণ্টা ছুঁইছুঁই করছে। ওয়েট্রেসের দেখা নেই। সোহেলের টেনশন বাড়ছে। এমন সময় ওয়েট্রেস এসে হাজির হলো। জিজ্ঞেস করল, তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন?

সোহেল বলল, আমি অক্সফোর্ডের ছাত্র। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে থিসিস করছি। বিগবসের সাহায্য না পেলে আমার কেরিয়ার শেষ।

ওয়েট্রেস ফিরে এসে বলল, এসো।

সোহেল পঞ্চাশ পাউন্ডের আরেকটি নোট এগিয়ে দিলো। মেয়েটি বকশিস গ্রহণ করল না। বলল, আমি জানতাম না তুমি একজন ছাত্র।

সোহেল একজন দৈত্যের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। যেটুকু তথ্য জানা ছিল সে তুলনায় অনেক ইয়াং। সোফায় বসে চুরুট টানছে। পাশে বসে এক অপূর্ব সুন্দরী তার বেসবাস ঠিক করছে। সোহেলকে দেখে বিগবসকে বলল, ডার্লিং, আমি যাই।

বিগবস হাত নাড়লো। সোহেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, এবার বলো আমার মতো খারাপ লোকের কাছে তোমার কী প্রয়োজন?

সোহেল বলল, আমি ছাত্র। থিসিস করছি। আপনার সহযোগিতা না পেলে আমি থিসিস শেষ করতে পারছি না।

মুহূর্তে একটা চড় এসে পড়ল সোহেলের গালে। সেই চড়ের ওজন কত ছিল তা বুঝে উঠার আগে চেয়ার উলটে মেঝেতে ছিটকে পড়ে সোহেল জ্ঞান হারাল।

পাঁচ দিন হাসপাতালে থাকতে হলো। সোহেলের একটা দাঁত খোয়া গেছে। পিটার জিজ্ঞেস করল, তুমি ছদ্মবেশ নিতে গেল কেন? তোমাকে গুপ্তচর মনে করে রেগে গেছে। চালাকি করা তোমার ঠিক হয়নি। যাক অল্পের ভেতর গেছে। বিগবসের কাছে আর যেও না। বাকি যে দুজন আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো।

একমাস বিশ্রাম নিয়ে সোহেল আবার রয়াল ক্যাসিনোতে গেল। সেদিনের সেই টেবিলটি বেছে নিলো। সেদিনের সেই তরুণী ওয়েট্রেস এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি আবার এসেছো?

সোহেল পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট বের করে বলল, বিগবস কি আজ এসেছে?

ওয়েট্রেস নোটটি নিলো না। বলল, বিগবস দশদিন ধরে আসছে না। সম্ভবত সে অসুস্থ।

তুমি কি আমার একটা উপকার করবে? সোহেল কাকুতি কণ্ঠে বলল, তাকে আমার খুব দরকার। প্লিজ, তার সঙ্গে দেখা করার একটা ব্যবস্থা করে দাও। আমি চিরকাল তোমার কথা মনে রাখব। সোহেল একশো পাউন্ডের পাঁচটি নোট তরুণী ওয়েট্রেসের দিকে এগিয়ে দিলো।

তোমার একটা দাঁত পড়ে শিক্ষা হয়নি? তোমার কোনো ক্ষতি হলে সে দায় আমার না মনে রেখো। আমার পরামর্শ হলো তার সঙ্গে তোমার দেখা না করাই ভালো।

আমার জন্য চিন্তা করো না। তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

তরুণীটি একটা ফোন নাম্বার দিয়ে বলল, তিনদিন পর এই নাম্বারে ফোন করে জেনে নেবে বিগবসের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া সম্ভব কি না। পাঁচশো পাউন্ড ফেরত দিয়ে বলল, দেখা সম্ভব হলে সেদিন টাকাটা দিও।

বিগবস অসুস্থ। ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছে। সোহেলকে বলল, আমার সঙ্গে কথা বললে প্রতি ঘণ্টার চার্জ একশো পাউন্ড। রাজি?

সোহেল বলল, রাজি।

বিগবস বলল, শুরু করো। তুমি কোন দেশের লোক?

বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ? সেটা আবার কোন দেশ! এর আগে নাম শুনিনি।

বাংলাদেশ কমনওয়েলথভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। গ্রেটার ইন্ডিয়া ব্রিটিশ কলোনি ছিল। ইন্ডিয়া ভাগ হয়ে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়। ইস্ট পাকিস্তান ও ওয়েস্ট পাকিস্তান মিলে হয় পাকিস্তান। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতার দাবিদার হয়। পাকিস্তানের সামরিক সরকার সংবিধান অনুসারে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে পূর্ব পাকিস্তানে জেনোসাইড শুরু করে। আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাঙালিদের আবাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ফাদার অব নেশান।

বিগবস হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার সেই ঘটনা মনে পড়ে যায়। ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে জর্জ হ্যারিসনের বিটলস দল ও ইন্ডিয়ান মিউজিসিয়ানরা মিলে বিশাল কনসার্ট করে ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফান্ড সংগ্রহ করতে এবং বিশ্বকে বাংলাদেশে পাকিস্তানি আর্মির জেনোসাইড, এক কোটি শরণার্থীর মানবেতর জীবন জানাতে। মানবতা জাগাতে। বিগবস তার কয়েকজন বন্ধুসহ সেই কনসার্টে ছিলেন।

বিগবস বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, সেই পুরানো ঘটনা আমাকে বলছ কেন?

বাংলাদেশ আর্মির একটি দল আমাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, অন্তঃসত্ত্বা নারী, দশ বছরের শিশুসহ নিকট আত্মীয় ২৪ জন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে।

আদালতে যাও। আইনের আশ্রয় নাও।

সামরিক সরকার সকল আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। সামরিক সরকারের প্রেসিডেন্ট ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে এবং জেনারেল জিয়া সংবিধান সংশোধন করে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জাতীয় সংসদে পাস করে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্যদের হত্যার বিচার পাওয়ার মৌলিক অধিকার চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হত্যাকারীদের বর্তমানে বা ভবিষ্যতে বিচারের আওতায় আনা যাবে না।

আবেগে-কান্নায় সোহেলের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে। কিছুটা সময় বিষণ্ন নীরবতায় কেটে যায়। বিগবস মৃদু স্বরে বলল, ভেরি স্যাড।

সোহেল বলল, বিচারের পথ খোলা থাকলে তোমার কাছে আসার প্রয়োজন হতো না।

তুমি কী করতে চাও ?

জাতির পিতাকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের মৃত্যু দেখতে চাই। হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। হত্যার প্রতিশোধ যতদিন নিতে না পারব দেশে ফিরব না। চাকরিতে জয়েন করব না। প্রেমিকা স্ত্রী হবে না। বাবা-মা, ভাইবোন কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না। তুমি আমার যে দাঁত ভেঙেছ তা-ও বাধাই করব না।

তোমার পরিকল্পনা শুনি ।

হত্যাকারীরা কে-কোথায় আছে, তাদের সকল বর্তমান তথ্য, তাদের ঠিকানা, ছবি, ফোন, কর্মস্থল, তাদের গতিবিধি, ম্যাপ এবং তোমাদের পারিশ্রমিক আমার কাছ থেকে পাবে। তোমাদের পাসপোর্ট, ভিসা, প্রয়োজনীয় অস্ত্র, মিশন সাকসেসফুল করা তোমাদের কাজ। শুনেছি তুমি কোনো মিশনে ব্যর্থ হওনি।

তোমার এ কাজের জন্য বিশাল অংকের টাকা দরকার। তোমাকে দেখে মনে হয় না তুমি তা দিতে পারবে।

তোমার ডিমান্ড বলো। দিতে পারলে হবে, নইলে বিদায় ।

ঠিক করেছিলাম ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে আর কোনো কাজ করব না। আমি খুব টাকার ক্রাইসিসে আছি। তোমাকে দেখে মায়া হচ্ছে। এ অন্যায় বিচারহীনতার সমাধান হওয়া উচিত। খুব কৌতূহল জাগছে তোমার নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্য। যার জন্য জীবনের সব মৌলিক চাহিদা বিসর্জন দিয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞা পালন করে চলেছ। এমনটা বাস্তবে হয় আমার জানা ছিল না।

তোমার অ্যামাউন্ট বলো ।

দলে আমরা ছয়জন থাকি। সিক্স মিলিয়ন পাউন্ড। অর্ধেক দেবে অ্যাডভান্স। কাজ শেষে বাকি অর্ধেক। মিশনের কোড নেম বলো?

মিশন বাংলাদেশ।

ওকে। অ্যাকাউন্টে তিন মিলিয়ন জমা হলে কাজ শুরু হবে। তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকবে না। দুমাস সময়। আমাদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবে না। খোঁজখবর করবে না। মিশন বাংলাদেশ, চিয়ার্স !

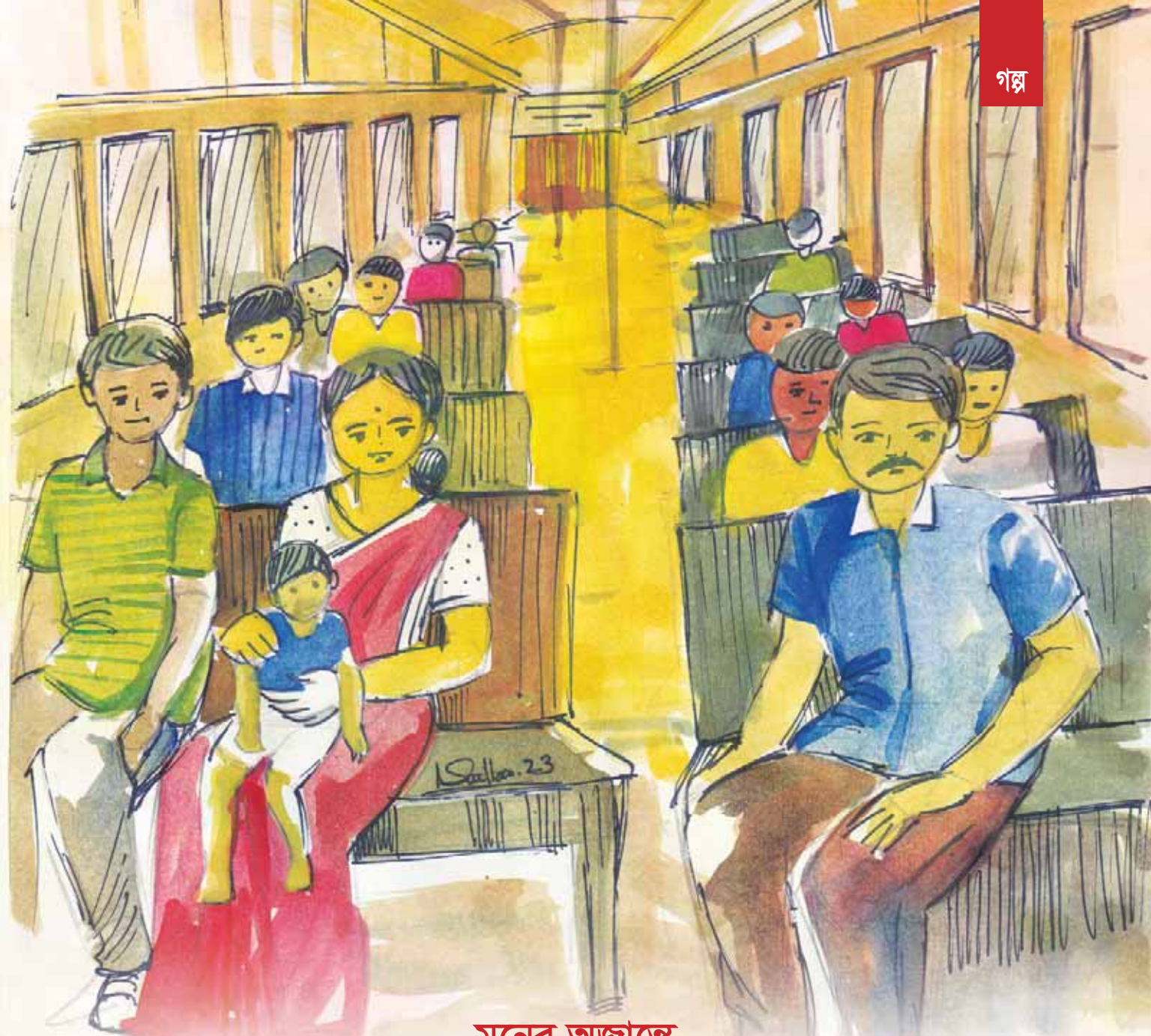

মনের অজান্তে

নাসিম সুলতানা

অফিস ছুটির পর সবসময় বাড়িতে চলে আসেন ইকবাল সাহেব। তার রাত ৮টা-৯টা হয়। ব্যাংকের চাকরিতো, একটা সেকশনের ইনচার্জ বলে কথা । সব হিসাব মিলিয়ে তবে ছুটি । কিন্তু আজকে দুপুর থেকে তার মনটা খুব খারাপ তাই আজকে তার কাজেও মন বসছে না। তাই তার সহকর্মীদের বলে বাড়ি না যেয়ে সোজা রমনা পার্কের লেকের ধারে বসল ।

ইকবাল সাহেব ধারে বসে বেঞ্চে হেলান দিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে সেই অতীতের ফেলে আসার দিনগুলোর কথা। মাগুরা তাদের বাড়ি। গ্রামের স্কুল ও কলেজ থেকে ভালোভাবেই পাস করে ঢাকা আসে এম কম পড়ার জন্য। আপা দুলাভাইয়ের বাড়িতে থেকে বাকি পড়াটা ভালোভাবেই পাস করল এবং তিন মাস পর নিজের যোগ্যতায় অফিসার পদে ব্যাংকের চাকরিটাও তার হয়ে যায়। কিন্তু এই পড়ালেখার ফাঁকে আপা প্রায়ই সময় বলত– ঝর্ণা নামে একটি মেয়ের কথা। সে এবার ডিগ্রিতে ভর্তি হয়েছে। দেখতে অত ফর্সা না হলেও নাক-চোখের গড়ন খুব ভালো, লম্বা, স্লিম ফিগার। আমাদের ইকবালের সাথে খুব মানাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো শুনতে শুনতে কখন যে মনের অজান্তে ইকবাল সাহেব মনে মনে মেয়েটির প্রেমে পরে গেছে সে বুঝতেই পারল না।

একদিন ইকবাল বলেই ফেলল এবার ঈদে যখন বাড়ি যাব তখন এই মেয়েটিকে দেখার কাজটা সেরে ফেলব। কারণ আমি এবার বিয়ে করব, আর তুমি যে মেয়েটির কথা বলছ তাকেই। একথা শুনে দুলাভাই হেসে দিয়ে বলল, ওরে বাবা আমার শালাতো দেখছি বিয়ের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। তুমি কেমনে জানলে

ঝর্ণাকে দেখলে তোমার পছন্দ হয়ে যাবে?

এদিকে আপা ফোনে ঝর্ণার সাথে প্রায় কথা বলে। ঝর্ণাও মনে মনে ইকবাল সাহেবকে কল্পনায় স্বামী হিসেবে মনে করতে থাকে। আপার সাথে ঝর্ণার পরিচয় অনেক দিনের তাই বিশ্বাস বলে কথা।

যথা সময় তারা সবাই মিলে ঈদে বাড়ি যায়। ঈদের একদিন পর তাদের ঝর্ণাকে দেখতে যাবার কথা। এমন সময় বিঘ্ন ঘটালো তাদের এক আত্মীয়। তিনি আমাদের বাড়িতে এসে বললেন ঝর্ণাকে দেখতে যাচ্ছে যাও কিন্তু বিয়ে করার মনোভাব নিয়ে যাও। দেখ আবার পরে না করা যাবে না। আমার মানসম্মান বলে একটা ব্যাপার আছে।

এ কথাতে ইকবাল সাহেব মনে মনে ভীষণ রেগে গেল। রাগ দমন করে সে তার ঘরে যেয়ে তার আপাকে বলল এ মেয়েকে আমি দেখতে যাব না। দেখতে গেলে বিয়ে করতে হবে এমন কন্ডিশন তো আমি দেয়নি। ইকবাল সাহেব জিদ করে মনস্থির করে ফেলল এখানে সে বিয়ে করবে না।

এখানে আমি ওকে দেখতেই যাবো না। আমি কালকেই ঢাকা চলে যাবো। ইকবাল সাহেবের কথায় সবাই হকচকিয়ে গেল। হায় হায় একি বলল ইকবাল। তার মা, বোন, দুলাভাই সবাই তাকে অনেক অনুরোধ করার পরও কোনো লাভ হলো না। ইকবাল সাহেব পরদিন ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলো।

এ যাত্রায় তার বিয়েটা আর হলো না। এদিকে ঝর্ণাও মনে মনে অনেক কষ্ট পেল। আপার কাছে সে শুনেছে এ কথা। কিন্তু ইকবাল সাহেবের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। ঝর্ণারও অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল।

দুজন যার যার সংসারে দিন কাটাতে লাগল। এখন ইকবাল সাহেব নিজে বাসা ভাড়া করে থাকে। তাদের সংসারে দুটি সন্তান। হঠাৎ তার মা অসুস্থ হওয়ায় ইকবাল সাহেবকে একাই বাড়িতে যেতে হয়েছে। কারণ ছেলেদের পরীক্ষা থাকার কারণে তার স্ত্রী সাথে আসতে পারেনি। কথা ছিল মা'কে নিয়ে সে আসবে। কিন্তু তার মা একটু অসুস্থ বোধ করায় সে একাই ঢাকা ফিরবে বলে ঢাকাগামী একটি কোচে উঠে বসল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল তার পাশের লাইনের সিটে বাচ্চা কোলে কে বসে আছে? সে মেয়েটাকে দেখে চমকে উঠল।

ইকবাল সাহেব বার বার মেয়েটিকে দেখছে। হ্যাঁ এ মেয়েটিতো ঝর্ণা। সে তার বোনের কাছে একটি ছবি দেখেছিল। সেই হরিণ টানা টানা চোখ, নাকটা বাঁশের মতো চিকন। সেরকম লম্বা না। গোলাপি রঙের সেলোয়ার-কামিজ ও মাথায় ওড়নাতে তাকে অপূর্ব লাগছে। হাঠাৎ তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। তার স্ত্রী ফরসা হলেও উচ্চতায় খাটো না হলেও অত লম্বা না। সে খাঁটো মানুষ পছন্দ করত না। ইকবাল সাহেব মনে করল– এ পৃথিবীতে মানুষ যা চায় তা সব পায় না। না পাওয়ার বেদনা ইকবাল সাহেবকে বড়োই যন্ত্রণা দিত। ঝর্ণার কোলে দেড় কি দুই বছরের মেয়ে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। পাশে একটি ছেলে বসা। মনে হয় তার ভাই হবে।

ইকবাল সাহেবের খুব ইচ্ছা হলো ছেলেটিকে ডেকে কথা বলতে? যাক এমন সময় বাসটি স্টেশনে এসে থামল। তখন ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল– তোমরা কোন গ্রাম থেকে এসেছ?

ছেলেটি গ্রামের নাম বলতে ইকবাল সাহেব জিজ্ঞেস করল– ও কি তোমার বোন ঝর্ণা। ছেলেটি বলল, হ্যাঁ। ছেলেটি তাকে কোনো প্রশ্ন না করে দোকান থেকে কিছু আনতে নীচে নেমে গেল। সেই ফাঁকে ইকবাল সাহেব মেয়েটির পাশে যেয়ে দাঁড়িয়ে বলল– ঝর্ণা কেমন আছ? আমাকে তুমি চিনতে পেরেছ? ঝর্ণা মলিন মুখে বলল, হ্যাঁ। ইকবাল সাহেব বলল, কেমন করে চিনলে– আমাদের তো কখনও দেখা হয়নি?

আপনি চিনলেন যেভাবে সেভাবে চিনলাম। ইকবাল সাহেব ব্যথিত কণ্ঠে বলল– কেমন আছ ঝর্ণা? তোমার কার সাথে বিয়ে হয়েছে? উত্তরে ঝর্ণা মলিন মুখে বলল– একজন পুলিশ এ.এস. আই লোকের সাথে। কোলের বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল– এ আমার মেয়ে দেড় বছর বয়স। ইকবাল সাহেবের কেন যেন মনে হলো ঝর্ণা সুখী না। তার মলিন চেহারায় কোনো হাসির ঝিলিক নেই। তার কথায় কোনো সুর নেই– নেই কোনো ছন্দ।

ইকবাল সাহেব অনেক মর্মাহত কণ্ঠে বলল– ঝর্ণা, তুমি যদি অনুমতি দাও তবে তোমার বাচ্চাকে আমি কিছু কিনে দিতে চাই। ঝর্ণা বলল– দোয়া দেন যাতে ও ভবিষ্যতে সুখী হতে পারে। আমার মতো দুর্ভাগ্য যেন না হয়। একথায় ইকবাল সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তারপর যে যার মতো সময়ের স্রোতে চলে যেতে থাকল। কিন্তু আজকে দুপুরবেলা গ্রাম থেকে কলিমুদ্দিন চাচার ফোনটা তাকে ব্যথিত ও মর্মাহত করে ফেলল। চাচা বলল, জানিস ইকবাল ঝর্ণা মারা গেছে। কি যেন কঠিন রোগ হয়েছিল। ফোনে কথাগুলো শোনার পর থেকে ইকবাল সাহেবের চোখের কোণা বার বার ভিজে আসছিল? এতদিন পর তার ঝর্ণার চেহারাটা বার বার মনে পড়ছে। সে নিজেকে অপরাধী মনে করছে? তবে কি সে নিজের মনের অজান্তে ঝর্ণাকে ভালোবেসে ছিল?

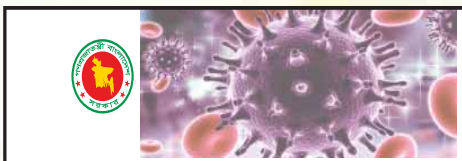

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/মগের জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্রিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

তারিখটা দশ

গোলাম নবী পান্না

তোমার এ আগমনে প্রেরণায় জাতি–
ভুলে যায় কষ্টের কালিমার রাত-ই।
অশ্রুসজল ছোঁয়া আবেগের ভাষা
এর মাঝে খুঁজে পায় নতুনের আশা।
নতুন আশায় জাগে প্রিয় এ স্বদেশ
জনগণ আর এই ছায়া পরিবেশ।
তোমার কণ্ঠে পেয়ে সাহসের বাণী
মুখরিত হলো তাতে চারদিক জানি।
এলে তুমি বীরবেশে কারাগার ছেড়ে
এসে এই বাঙালির মন নিলে কেড়ে।
জানুয়ারি এলে আর তারিখটা দশ
খুঁজে পায় যেন নেতা তোমার পরশ।
'বঙ্গবন্ধু' তুমি প্রাণের স্বজন
জয় করে নিয়েছো বাঙালির মন।
এভাবেই জনগণ মনে নিলে ঠাঁই
স্মৃতির পাতায় নেতা ফিরে আসো তাই।

বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন

ইউসুফ রেজা

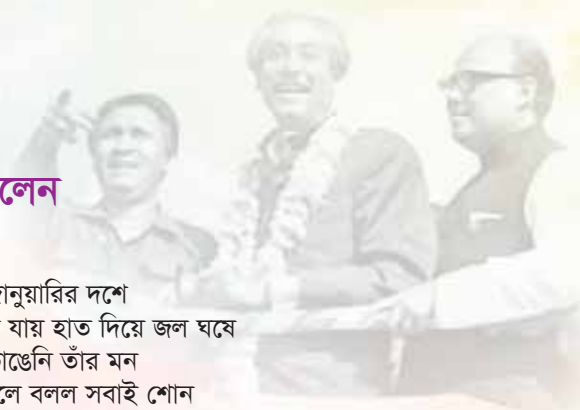

রাজপুত্র ফিরে এলেন জানুয়ারির দশে
কান্নায় তাঁর চোখ ভেসে যায় হাত দিয়ে জল ঘষে
জীর্ণ শরীর ক্লান্ত দেহ ভাঙেনি তাঁর মন
কালো ফ্রেমের চশমা খুলে বলল সবাই শোন
মাটি খুঁড়ে বানিয়েছিল ওরা আমার কবর
তোরা কি কেউ পেয়েছিলি সেই ভয়ানক খবর?
বলেছিলাম আমার গলায় যদি চড়াও ফাঁস
আমার প্রিয় বাংলাদেশেই পাঠিয়ে দিও লাশ।
জেল-জুলুম আর অত্যাচারের ভয় পাইনি কোনও দিন
কিন্তু আমার দেশের কাছে আজও আছে অনেক ঋণ
এদেশ স্বাধীন করতে গেল ত্রিশ লক্ষ প্রাণ
কেমনে ভুলে যাব আমরা তাদের অবদান
যেই দুই লাখ মান হারালো তাঁরাও আমার মেয়ে
আদর কিছু কম না তাঁদের আমার হাসুর চেয়ে
সব ধ্বংস করে গেছে জানোয়ারের দল
নতুন করে গড়তে হবে মনে রাখবা বল।
খুনি দালাল ধর্ষকেরা পার পেয়েছে কবে
কথা দিলাম তাদের বিচার এই মাটিতেই হবে
পোড়া মাটির সোনার মানুষ কথায় দিলেন সায়
লক্ষ কোটি জনতা তাঁর পিছে পিছে যায়।

নেতা এলেন!

আ. শ. ম. বাবর আলী

খবর এলো নেতা আসবেন–
সুদীর্ঘ নয় মাস
রাক্ষসপুরীর বন্দিশালা থেকে মুক্তি নিয়ে
নেতা আসবেন।
অদম্য বীরত্বে অর্জিত
স্বাধীনভূমিতে
সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভালোবাসার টানে।

নেতা আসবেন, একথা শুনে
আনন্দে উদ্বেলিত হলো
বঙ্গোপসাগরের উত্তাল আনন্দঢেউ,
বাঁধভাঙা আনন্দগীতি গেয়ে উঠলো
লক্ষ কোটি পাখি,
ডানা মেলে ছুটলো সবে
প্রিয়নেতা দর্শনে।
শত বৈচিত্র্যের রঙে
উঠলো ফুটে
কোটি বৃক্ষের অজস্র ফুল;
বুকভরা সুগন্ধ বুকে নিয়ে
উজ্জীবিত হলো ওরা
নেতৃবরণে।
আনন্দে সুউচ্চ হলো
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের
গর্বিত ভূভাগ!

নেতা আসবেন! নেতা আসবেন!
কবে আসবেন! কখন আসবেন!
অস্থির জনতা!
প্রতীক্ষা আর কত?
ধৈর্য তো মানে না মনে–
কখন আসবেন নেতা?
কখন! কখন!

অবশেষে ঐ দূরের কালোমেঘের
বক্ষ বিদীর্ণ করে এসেছেন
ঐ যে নেতা!
কানফাটা জয়ধ্বনি চারদিকে
আনন্দে উত্তাল!

অবশেষে নেতা এলেন–
পা ছোঁয়ালেন
তাঁরই তৈরি স্বাধীন মৃত্তিকায়।
হুমড়ি খেয়ে পড়লো সকল জনতা
নেতৃদর্শনে–
নেতা কই! কই নেতা!
সুউচ্চে মাথা তুলে পর্বত তাকায়
নেতাকে দেখিতে।
দলে দলে ছুটে আসে–
যত বৃক্ষ, যত আলো, যত প্রাণিকুল।
গগনবিদারী উচ্ছ্বাস আনন্দধ্বনি–
জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু! ...

বঙ্গবন্ধু, তুমিই বাংলা শ্যামল কবিতা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

চারদিকে কলরব
আগামীকাল
কী জানি কী হয়,
স্বাধীনতার ডাক
মুক্তিযুদ্ধ
নাকি অন্য কিছু,
হাজার হাজার
উদ্বেলিত
মুখরিত জনতা,
স্বাধীনতা ছাড়া
অন্য কিছু
গ্রহণযোগ্য নয়;
পিচঢালা পথ
তপ্ত বেশ
উঠেছে জেগে,
উঠানে উঠানে
অলিগলিতে
পথের বাঁকে,
কোলাহল
ফিসফাস
কাল কী জানি কী হয়
রেসকোর্সের মাঠ
আগামীকাল
কী জানি কী কয়।
উদ্বেগ
উৎকণ্ঠা
মুখরিত জনতা,
স্লোগানে স্লোগানে
দিয়ে যায় যত
মুক্তির বারতা,
পিঁপড়ের মতো
শত দিক থেকে
শত মিছিল,
এক মোহনায়
যেন নদী
সাগরের মিল;
কেঁপে কেঁপে উঠে
রাজপথ
যেন অগ্নিগিরি,
কীসের নেশায়
কী আশায়
এত মিছিলের সারি,
কী জানতে চায়
নেতার কাছে
কী শুনতে চায়,
স্বাধীনতার
কবিতা ছাড়া
বাড়ি ফেরা নয় ॥

নেতা এলেন
সুরে নিলেন
লাখো লাখো সুর,
কখনো কঠিন
কখনো নরম
কখনো বেদনাবিধুর,
গগনবিদারী
স্লোগানে স্লোগানে
রেসকোর্স কথা কয়,
নারীতে পুরুষে
কৃষক শ্রমিকে
যেন একাকারময়;
হেমিলনের
সে সুর শুনে
বিমোহিত জনতা
খুঁজে নিয়েছে
আগামীর পথ
খুঁজে পেয়েছে বারতা,
বঙ্গবন্ধু,
তুমি তপ্ত দুপুরে
রাজপথে মুখরিত মিছিল
তুমিই বাংলা
শ্যামল কবিতা
সুরের অন্তমিল ॥

একটি মাটির প্রদীপ

সাঈদ তপু

একটি মাটির প্রদীপ
অথচ সূর্যের ধারণ ক্ষমতা তাঁর ভেতর
বুকের মাপ চল্লিশ হতে বিয়াল্লিশ
অথচ হৃদয়ের মাপ
পুরো মানচিত্রজুড়ে
চোখ তাঁর জীবনানন্দের
ধানসিঁড়ির টলমল অমাবস্যা
অথচ স্বপ্ন হিমালয়ের এভারেস্ট ছাড়িয়ে
আজও দাঁড়িয়ে আছেন লৌকিকতার ভিড়ে,
আছেন জনতার মঞ্চে, ভাষণের ধৃষ্টতায়,
আসনের শিল্পে ও মানবতার প্রতীকে।
আদর্শের বিচারে শীর্ষে থেকে
প্রেমের টানে মাটি টালমাটাল
হরতাল, অবরোধ, তারও উপরে দেশবোধ
রক্তের হোলি খেলা, অতঃপর প্রতিশোধ
ধীরে ধীরে লাল-সবুজের উত্তোলন
হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন-সংগীতে
আর এ স্বপ্নের বিকিরণ হলো সেদিন
সেই মাটির প্রদীপ ঘিরে।

প্রত্যাবর্তনীয় অনুষঙ্গ

গোবিন্দলাল সরকার

দেশ যদিও স্বাধীন হলো ষোলোই ডিসেম্বর
পাকিস্তানি কারাগারে পিতা মুজিবর
বন্দি পিতা এখনও কি জীবিত বা মৃত!
পঁচিশে মার্চ শেষ প্রহরে পিতা অপহৃত
শঙ্কা বুকে থাকে চেয়ে বীর জনতার ঢল
হাত উঁচিয়ে এবার বলে– 'করাচিতে চল'–
'শেখ মুজিবের আনতে সবাই ভাঙবো জেলের তালা
জুলফিকারের ভেক গদিকে জ্বালা আগুন জ্বালা'
গর্জে যখন উঠল আবার দেশের নারী-নর
বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়– মুক্তি অতঃপর
জানুয়ারির দশ তারিখে মুক্ত জাতির পিতা
ব্রিটেন ঘুরে দিল্লিতে যান– ইন্দিরাই তাঁর মিতা
অমিত যাঁর মিত্রতাতে নয় মাসেতে জয়
সম্মানে তাঁর দু'চোখে জল এইতো অনুনয়
দশ তারিখের সকালবেলা ভারত সফর শেষে
মধ্যদুপুর ফেরেন পিতা স্বাধীন বাংলাদেশে
সাতকোটি তার বীর বাঙালি মানুষ যদি হলো
'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' বোলে দু'হাত তোলো।

বঙ্গবন্ধু

তুষার আলমগীর

শোন দেশের জনগণ–
বঙ্গবন্ধুর বিবরণ–
খোকা নামের সেই ছেলেটা বাঙালির মিতা,
খোকা নামের সেই ছেলেটা জাতিরও পিতা।

শেখ মুজিব নামটি তার, বঙ্গবন্ধু উপহার
সাত কোটি বাঙালির মুক্তিদাতা।
মনে ছিল না ভয় ... করিলেন বাংলা জয়
বাঙালির অন্তরে তাই রইয়াছেন গাঁথা।
খোকা নামের সেই ছেলেটা বাঙালির মিতা,
খোকা নামের সেই ছেলেটা জাতিরও পিতা।

ও যার জীবন, যৌবন জেলে কাটে, কাজ করিলেন হাঁটে মাঠে–
নিরীহ বাঙালিদের করতে একতা
নিজের জীবন তুচ্ছ করে...বাঙালিরা অস্ত্র ধরে
বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়ায় পেল স্বাধীনতা।
খোকা নামের সেই ছেলেটা বাঙালির মিতা,
খোকা নামের সেই ছেলেটা জাতিরও পিতা।

তরুণ প্রজন্ম আজ, নিরলস করে কাজ
জাতির পিতার স্বপ্ন যেন যায় না গো বৃথা
ও তাই শেখ হাসিনার দুই নয়ন করবে জাতির উন্নয়ন
দেশবাসী দিলে তারে অন্তরের কথা।
খোকা নামের সেই ছেলেটা বাঙালির মিতা,
খোকা নামের সেই ছেলেটা জাতিরও পিতা।

মুজিব আমার

শেলী সেলিনা

মুজিব আমার স্বপ্নে আঁকা
বাংলাদেশের ছবি
মুজিব আমার প্রথম দেখা
প্রজ্বলিত রবি।
মুজিব আমার অন্তর দিয়ে
প্রথম পিতা ডাকা
মুজিব নামের ছবি আছে
বাংলাদেশে আঁকা।
মুজিব আমার ষড়ঋতু
মুজিব বারোমাস
মুজিব আমার অস্তিত্ব
মুজিব বাঁচার আশ।

মহান ছেলেটি কে

মো. আব্দুল হাই

রূপে গুণে ভরা মোদের বাংলা মাগো তুমি
সকল দেশের চেয়ে সেরা আমার জন্মভূমি।
ধন-সম্পদে ভরা তুমি, জন্মলগ্ন থেকে
এসব কথা প্রকাশ পায়, পর্যটকের মুখে
ভিনদেশিরা এলো বাংলায় লুটলো অর্থকড়ি
ধন-সম্পদ রত্নভাণ্ডার নিলো জাহাজ ভরি।
গরিব চাষিকে ঋণ দিয়ে করায় নীল চাষ
চৈত্র মাসে পাইক পেয়াদা গলায় পরায় ফাঁস।
অত্যাচারের শেষ হতো না বাঙালি ছিল বোকা
এমন সময় জন্ম হলো টুঙ্গিপাড়ায় এক খোকা
দিনের পরে দিন চলে যায় মাসের পরে বছর
বড়ো হয়ে ফিরে এলো সে ঢাকা শহর
প্রতিবাদী কণ্ঠ তাঁর ভাবেন দেশের কথা
গরিব-দুখি দেখে তাঁর বুকে বাজে ব্যথা
গর্জে উঠলো সাত মার্চে রেসকোর্স ময়দানে
সাড়া দিলো বাঙালির মাতৃভূমির টানে।
স্বাধীন হলো মুক্তি পেলে বাংলা মাগো তুমি
তোমার জন্য জন্মেছিল শ্রেষ্ঠ এক গুণী
এত মহান এত গুণী সেই ছেলেটি কে?
ছোট্ট খোকা টুঙ্গিপাড়ার জাতির পিতা সে।

পিতা, পিতা বলে ডাকি

নজরুল হায়াত

পিতা, পিতা বলে ডাকি, পিতা কই?
কারা জানি অসূয়ার কুটিল করাতে
পিতার দিঘল দেহ কুটি কুটি কাটে,
লোহুর সাগরে ভিজায়ে তাহার জামা
কারা জানি লাল রঙে সাজিয়েছে তাঁকে,
ঘন লোম, গায়ে দেয়া নিমা, সাদা তহবন্দখানা
লুকাতে চেয়েছে মিছেমিছি
ঘোর তমসাবৃত অমানিশাতে,
পারেনি, ফের রোশনাই
তাঁর দেহখানা আবার এসেছে ফিরে
ঘন সবুজের মাঝখানে এই বাংলায়
লালসূর্যের অফুরান রং সুপ্রাচীন ছায়াময় ভোরে;

আজ পাখিদের কাকলি কূজন তাঁরে ঘিরে
নদী বয়ে চলে, সাগরের জল ফুঁসে ওঠে
ছিকায় ছিকায় গাঁয়ের বধূরা কবিতার পদ লেখে
অযুত কৃষক খেতের কিনারে তাঁর কথা বলে বলে
গল্প অশেষ ধানের গুচ্ছে অবিরাম রুয়ে চলে
নগরের পথে মিছিলে মিছিলে তাঁর ছায়া আগে বাড়ে;

পিতা, পিতা বলে ডাকি, পিতা কই?
তোমার হৃদয়ে পিতার শরীর, আকাশ-উদার মন
জেগে আছে দেখো অমলিন সেই বজ্র কণ্ঠস্বর
বদ্বীপ-সমান বন-বীথিকার শ্যামল বাগান ছেয়ে।

হৃদয়ে বাংলাদেশ

কাব্য কবির

বাংলাদেশের নাম লিখেছি আমার হৃদয় মাঝে,
দেশটা আমার আছে যেন রূপের রানি সাজে।
পূর্বদিকে রোজ সকালে সোনার রবি ওঠে,
কিচিরমিচির পাখি ডাকে, বাগানে ফুল ফোটে।

সকালবেলা ঘুমটা ভাঙে দোয়েল পাখির শিসে,
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান থাকি মিলেমিশে।
ভালোবাসার রুমাল দিয়ে মুছে ফেলি রাগ,
ঈদ ও পূজার আনন্দটা সবাই করি ভাগ।

উদাস সুরে ঘুঘু ডাকে হয় যখনি দুপুর,
পাঁতিহাস ও ডাহুক, কোড়া পরে ঘাসের নূপুর।
দৃশ্য দেখে মুচকি হাসি, দেয় হৃদয়ে দোলা,
রূপের সেরা অপরূপা যায় না দেশকে ভোলা।

ভালো লাগে সবুজ-শ্যামল দেশমাতারই হাসি,
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

আমরা বীর বাঙালি

রুস্তম আলী

জাতীর পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে
ভিত্তিহীন দুর্নীতির অভিযোগ উপেক্ষা করে
নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু।

ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা
এক সাগর রক্তে কেনা মাতৃভাষা।

ইংরেজদের দুর্গ ভেঙে গুটিয়ে দিয়েছে
বীর বাঙালি সূর্য সেন, প্রীতিলতা।

সাবাস বাঙালি–
এ পৃথিবী অবাক চেয়ে রয়
রক্তচক্ষু, ষড়যন্ত্রকারী রুখে
বাঙালি দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে।

মেঘঝরা নদীকূলে

আবু জাফর আবদুল্লাহ্

মেঘঝরা নদীকূলে আমার নিবাস।
শত চেষ্টা করেও তার মায়াবী কূল থেকে
যেতে পারিনে কোথাও কোনোখানে।
এ আমার চেতনায় লালিত প্রেম
তার প্রতি অবিরল।
মেঘঝরা আমার একটি প্রিয় নদীর নাম।
যার সাথে আমার অনেক স্মৃতিবিজড়িত
সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার।
দুঃখের বেশি নাকি সুখের
হিসাব করে দেখিনি।
বিধাতা কেন যে এমন করে দিলেন
'সাধ না মিটিতে' ভেঙে যায় খেলা।

আমি কবিতা লিখি

আবুল কালাম আজাদ

আমি কবিতা লিখি মানুষের কথা বলব বলে
আমি কবিতা লিখি প্রকৃতির কথা বলব বলে
আমি কবিতা লিখি সব অসুন্দরের বিরুদ্ধে দাঁড়াব বলে
আমি কবিতা লিখি সব সুন্দরের পাশে বসবো বলে
আমি কবিতা লিখি প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করব বলে
কবিতা সব বিভেদের বেড়াজাল ছিঁড়ে, সব ভেদাভেদ মুছে
ভালোবাসার কথা বলে।

নিয়ম পেলে মেট্রোরেলে

আতিক রহমান

মেট্রোরেলে উঠা নিষেধ তাদের–
বদ অভ্যাস রয়েছে ঠিক যাদের।
টিকেট ছাড়া উঠলে পরে
জেল রয়েছে খাঁচার ঘরে!
বিষবাষ্প ধোঁয়ার জন্য দায়ী–
জরিমানা গুনবে যে ধূমপায়ী!
আবেদনে নিষেধ করজোর–
পিক ফেলতে পারবে না পানখোর!
ট্রেনের গায়ে লিখলে আঁকিবুঁকি–
তাদের জন্য অপমানের ঝুঁকি!
হকারদের বেচাকেনার ধুম–
চলবে না ভাই অলসতার ঘুম।
ভিক্ষুকের ভিক্ষা করা না না
ট্রেনে এমন হাতপাতা ঠিক মানা!
নারীর জন্য আলাদা কম্পোট
রক্ষণাবেক্ষণে চাই সকলের সাপোর্ট।
এগিয়ে চলি মেট্রোরেলে কাঁধে রেখে কাঁধ,
ঘুচবে এবার বদ অভ্যাসের সকল অপবাদ?

নব প্রত্যয়ে জাগো

পারভীন আকতার

পুব আকাশে রঙিন আভা; নতুন আলোকচ্ছটা,
পুরান দিনের রেশ কাটিয়ে খুশির জোয়ার ভাটা।

একদিকে যায় অতীত ফিরে; অন্যদিকে নব আশা,
জাগিয়ে রাখে পুষ্ট হৃদয়; নিত্য স্বপ্ন বুনছে খাসা।

প্রতি মুহূর্তে চলছে শুধু কত শত পরিকল্পনা,
এটা করব ওটা করব; ভবিষ্যৎ নাই কারও জানা।

তবুও মানুষ স্বপ্নে বাঁচে; বসতি গড়ে স্বপ্নের মাঝে,
সকালটা আজ নাইবা ভালো; কালতো ভালো সাঁঝে।

নতুন বছর নতুন কুঁড়ির সুখ সোনাই মোড়া কাঠি,
কর্ম সময় মহামূল্যবান অতি; পুণ্যের জীবন খাঁটি।

নতুন দিনে নতুন প্রত্যয়; এসো সবে শান্তির পথে,
নতুন করে ভাবতে শিখো প্রাণের আলোর রথে।

নতুন বছর নতুনের আবাহনে

মুহাম্মদ ইসমাঈল

নতুন বছর নতুনের আবাহনে
আমরা পথ চলি
নতুন অনুভূতি
নতুন পরিকল্পনায় এগিয়ে চলি
সব কিছুতেই যেন নতুন নতুন গন্ধ লেগে আছে
নতুন গন্ধের আনন্দে আমরা হয়ে উঠি রঙিন
জীবনকে করি আনন্দময়।

মেট্রোরেল

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

ঢাকার বুকে নতুন খেল
চলবে এবার মেট্রোরেল
শেখ হাসিনার নতুন দান
সবার এখন ফুল্ল প্রাণ।

মেট্রোরেল মেট্রোরেল–
লাগবে না ভাই মবিল-তেল
আনন্দতে ঢাকার মানুষ
খুশির চোটে ওড়ায় ফানুস।

ঢাকার বুকে নতুন খেল
পথেঘাটে বাজছে বেল
চলবে দ্যাখো উড়াল গাড়ি
যানজটের তো নেইকো আড়ি।

মেট্রোরেল মেট্রোরেল–
খুশির হাওয়ায় নাচছে দেল।

শীত বায়ু

ফায়েজা খানম

ভোরের কিরণ খুঁজে হই দিশেহারা,
পাতার ফাঁকে, দূর্বাঘাসে।
সব জায়গাতেই কুয়াশায় মোড়া।
চাঁদের বুড়ির গল্পে মজি
দাদুর কোলে গা ঘেঁষে যে,
লেপ কাঁথা দিয়ে ভূত সাজি
এই না শীত নেমে এলো সে।
পিঠা পুলি পায়েসের ধুম,
কেড়ে নিয়ে সব রাতের ঘুম।
চিতই, ভাপা, দুধ পুলি
নারিকেল মেরা, সিদ্ধ কুলি,
রসের চিতই, রসের পায়েস
খেয়ে দেয়ে আরাম আয়েস।
তাই যাই নানাবাড়ি
চুরি করতে রসের হাঁড়ি।
শীত কলসে পিঠার রেশ,
জমছে ভালোই, লাগছেও বেশ।
শীতের হাওয়া লাগলো মনে
কত কষ্ট! দরিদ্ররাই জানে।
মরমরে সব পাতার দলে
শিশির বিন্দু ঘাসের কোলে।
শুষ্কতায় সাজে প্রকৃতি
চলে নীরব ক্ষণ,
নিরিবিলি সব শীতের গীতি
কুয়াশায় শনশন।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে বিশ্বে রোল মডেল বাংলাদেশ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদার ভূমিকা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। ৩রা জানুয়ারি 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৩' উপলক্ষে এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ। স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী আহ্বানে তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে তৎকালীন পুলিশের সদস্যরা ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদার সদস্যগণ শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতি–এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছেন। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদার ভূমিকা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। কোভিড-১৯ মহামারিকালে পুলিশের কার্যক্রম দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। করোনাকালে জীবন উৎসর্গ করেছেন অকুতোভয় অনেক পুলিশ সদস্য। তিনি দেশ ও জনগণের কল্যাণে জীবন উৎসর্গকারী সেসব পুলিশ সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৭ই ডিসেম্বর ২০২২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশের সংবিধান অনুষ্ঠানে সুপ্রীম কোর্টের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার প্রধান বিচারপতি জয়ানথা জয়সুরিয়াকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন –পিআইডি

মেট্রোরেল উদ্‌বোধন জনবান্ধব সরকারের আরেকটি সাফল্য

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মেট্রোরেলের উদ্‌বোধনের মাধ্যমে জনবান্ধব সরকারের আরেকটি সাফল্য অর্জিত হলো। মেট্রোরেলের যাত্রা ঢাকা মহানগরীর যাতায়াত ব্যবস্থায় ভিন্ন মাত্রা ও গতি যোগ করবে। ২৮শে ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রথম মেট্রোরেল উদ্‌বোধন উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশে প্রথম মেট্রোরেল 'ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬' উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের শুভ উদ্‌বোধন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি অনন্য মাইলফলক।

তিনি বলেন, সড়ক, পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) ৬টি মেট্রোরেল লাইন সমন্বয়ে ঢাকা মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী ও সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশ 'রূপকল্প–২০৪১' বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। সরকারের বিচক্ষণতা, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সাহসী নেতৃত্বের ফলশ্রুতিতে ঘনবসতিপূর্ণ জনসংখ্যার ঢাকা মহানগরীতে সুষ্ঠুভাবে মেট্রোরেল নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। অনেক বাধাবিপত্তি এবং নভেল করোনাভাইরাস মহামারি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ক্ষতিকর প্রভাব জয় করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এমআরটি লাইন-৬ বা বাংলাদেশের প্রথম অংশের উদ্‌বোধন সরকার, ঢাকা মহানগরবাসী ও অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টারই ফসল।

তিনি আরও বলেন, মেট্রোরেল চালুর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী তথা দেশের যোগাযোগ ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। ব্যাবসাবাণিজ্যে বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও এর সুফল পাওয়া যাবে।

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে

দিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৫ই ডিসেম্বর এক বাণীতে এ কথা উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের এদিনে আমরা অর্জন করেছি কাঙ্ক্ষিত বিজয়। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যে স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়েছিল, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এদিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়।

আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি– একথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন দেশে ফিরে জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন কৃষি বিপ্লবের। আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন দুর্নীতি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী, লুটেরাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে উন্নয়নের সেই অভিযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। রুদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথ, উত্থান ঘটে স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের।

তিনি আরও বলেন, দেশে আজ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প–২০২১' সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ঘোষণা করা হয়েছে 'রূপকল্প–২০৪১'। সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির ফলে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

স্মার্ট বাংলাদেশের নতুন সংযোজন মেট্রোরেল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুল কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের মেট্রোরেলের উদ্‌বোধন করেন। আর এই মেট্রোরেলকে স্মার্ট বাংলাদেশের নতুন সংযোজন হিসেবে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী। ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২ উত্তরার ১৫ নম্বর সেক্টরের 'সি' ব্লকের মাঠে মেট্রোরেল উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের শুভ উদ্‌বোধন উপলক্ষে সুধী সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, মেট্রোরেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত গতির রেল যুগে প্রবেশ করল। ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার গতিতে চলবে মেট্রোরেল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের গর্ব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মেট্রোরেল বাংলাদেশের নগর গণপরিবহণ ব্যবস্থায় একটি অনন্য মাইলফলক।

মেট্রোরেল ব্যবহারে সবাইকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক টাকা খরচ করে মেট্রোরেল করা হয়েছে। এটা সংরক্ষণ করা, মান নিশ্চিত করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ব্যবহারকারীদের দায়িত্ব। ডিজিটাল ডিভাইস যেন নষ্ট না হয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নবান হবেন। কেউ যেন আবর্জনা না ফেলে, খেয়াল রাখবেন। উল্লেখ্য, মেট্রোরেলের প্রথম যাত্রার প্রথম যাত্রী হিসেবে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জানুয়ারি পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩' উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

স্মার্ট ও বিশ্বমানের হবে পুলিশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পুলিশকে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের 'স্মার্ট পুলিশ' হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে তাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে একটি দক্ষ এবং বিশ্বমানের 'স্মার্ট পুলিশ' গড়ে তোলা। ৩রা জানুয়ারি রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে ছয় দিনব্যাপী 'পুলিশ সপ্তাহ ২০২৩'-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার পুলিশবাহিনীকে ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যানবাহন সরবরাহ করেছে। পুলিশের গতিশীলতা ত্রিমাত্রিক পর্যায়ে উন্নীতকরণে ইতোমধ্যে রাশিয়া থেকে দুটি হেলিকপ্টার ক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশবাহিনীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এভিয়েশন ইউনিট গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সর্বদা এ দেশের পুলিশকে 'জনগণের পুলিশ' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন এবং আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের পুলিশবাহিনী এখন জনগণের পুলিশ হিসেবেই

তাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মানুষের তথা জনগণের আস্থা অর্জন করা যে-কোনো বাহিনীর জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনারা তা করে যাচ্ছেন। অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আপনারা এই সেবা করে যাবেন। জনগণের মনে পুলিশের প্রতি যে আস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেটা যেন অক্ষুণ্ন থাকে। উল্লেখ্য, এবারের পুলিশ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী ১১৭ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল (বিপিএম) সাহসিকতা, রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম) সাহসিকতা, বিপিএম সেবা এবং পিপিএম সেবা প্রদান করেন।

ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়ন করেছে। বর্তমান সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও খেলাধুলার মানকে আরও উন্নত করার জন্য অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও ক্রীড়া ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ 'সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২'-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনন্য গৌরব অর্জন করেছে মেয়েরা। ২৯শে ডিসেম্বর ২০২২ বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক চতুর্থবারের মতো 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০২২' এবং তৃতীয়বারের মতো 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০২২' সফলভাবে আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার আধুনিক সুবিধা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা প্রথম পর্যায়ে দেশের ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৮৬টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে দেশের অবশিষ্ট ১৭৩টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের অধিকতর উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২৭তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা জানুয়ারি ২০২৩ রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ ২০২৩) উদ্‌বোধন করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের প্রতি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ ও রপ্তানি বাড়ানোর আহ্বান জানান। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। এবারের মেলায় সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া এবং ভারতসহ ১০টি দেশের প্রায় ১৭টি সংস্থা অংশ নেয়। উল্লেখ্য, মেলায় দেশি-বিদেশি মিলে মোট ৩৫১টি স্টল, প্যাভিলিয়ন, মিনি প্যাভিলিয়ন থাকবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

মনের দুয়ারও খুলে দিয়েছিল ভারত

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ১৯৭১ সালে ভারত শুধু তাদের সীমান্ত খুলে দেয়নি, ঘরের দুয়ারই খুলে দেয়নি, মনের দুয়ারও খুলে দিয়েছিল। নিজে না খেয়ে বা কম খেয়ে এদেশ থেকে যাওয়া শরণার্থীদের তারা খাইয়েছে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন সেটি আমাদের দেশের মানুষ মনে রাখবে। ১০ই জানুয়ারি রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সফররত ৩৪ জন ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দুই দেশের মৈত্রী রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। আমরা বাংলাদেশিরা, এদেশের সমস্ত নাগরিক, যতদিন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের হাতে ১০ই জানুয়ারি ২০২৩ ঢাকায় তথ্য ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সফররত ভারতীয় সাংবাদিকবৃন্দ শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

বাংলাদেশ থাকবে ততদিন আমরা ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব তাদের ভূমিকার জন্য। কলকাতার ২৫ জন ও আসামের ৯ জন সাংবাদিকের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আপনারা বাংলাদেশের কিছু অংশ ঘুরে দেখেছেন এবং নিশ্চয়ই বাংলাদেশে যারা ১২-১৪ বছর আগে এসেছিলেন, তারা পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন। এমনকি দু'বছর আগেও যিনি এসেছিলেন, দু'বছর পরেও অনেক পার্থক্য দৃশ্যমান। আমাদের দেশের মানুষ এই পার্থক্যটা খুব একটা বুঝতে পারে না। কারণ সবাই উন্নয়নের ভেতর দিয়েই যাচ্ছে। কিন্তু যে ছেলে ১৪ বছর আগে বিদেশ গেছেন, সে এসে তার শহর চিনতে পারে না, তার গ্রামও চিনতে পারে না–এটিই বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।

বাংলাদেশকে সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বর্ণনা করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে যে সামাজিক সম্প্রীতি, সম্প্রদায়ে

সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতি–এটি অনেক দেশের জন্য উদাহরণ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। আমরা সেটিই লালন করি, বুকে ধারণ করি। সে কারণে আমাদের দেশে প্রতিবছর উৎসবের মাত্রা বাড়ে। গত বছর দুর্গাপূজা মণ্ডপের সংখ্যা তার আগের বছরের চেয়ে কয়েকশো বেশি ছিল। সরকার সেক্ষেত্রে সহায়তা করে নানাভাবে। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে বাঙালিদের জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান থাকতে পারে না– দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন। এসময় কোনো গুজব যেন সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করতে না পারে, সেজন্য সকল সাংবাদিকের সহযোগিতা কামনা করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসময় ভারতীয় সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপদ প্রত্যাবাসনে তিনি ভারতের সহায়তা কামনা করেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতোই এখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রয়েছে জানান এবং অর্থনীতি প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের মাথাপিছু আয় বলে দেয় এদেশ থেকে অর্থনৈতিক কারণে কোনো প্রতিবেশী দেশে অনুপ্রবেশ ঘটার কোনো কারণ নেই।

ভারতীয় সাংবাদিকদের পক্ষে কলকাতা প্রেসক্লাব সভাপতি স্নেহাশিস সুর বলেন, আজকের ১০ই জানুয়ারি দিনটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের কাছে বিশেষ দিন নয়, এটা ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়ের কাছে একটা বিশেষ দিন। কারামুক্তির পর এদিনেই স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের জাতির পিতা এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের মাটিতেও প্রথম পা দিয়েছিলেন, বাংলাদেশের মাটিতেও প্রথম পা দিয়েছিলেন। আর এদিনে বাংলাদেশের মাটিতে থাকতে পেরেছি সেজন্য আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত। এ দিনের ইতিহাসটা আবার মনে করছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, সে সময় বঙ্গবন্ধু জীবিত আছেন কি না দীর্ঘদিন ধরে এটাও একটা সংশয় ছিল। আমরা আমাদের বাবা-মা'র কাছে সেটাই জিজ্ঞেস করতাম। আসামের আঞ্চলিক সংবাদ টিভি চ্যানেল প্রাগ নিউজের প্রধান সম্পাদক প্রশান্ত রাজগুরু তার বক্তব্যে তাদের আমন্ত্রণ করে একটি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ দেখাবার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার ভ্রমণ আমাদের নয়ন খুলে দিয়েছে।

মতবিনিময় শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ভারতীয় সাংবাদিকদের জন্য *সচিত্র বঙ্গবন্ধু, সংবাদ শিরোনামে বঙ্গবন্ধু, Humane Bangladesh, টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের পর্যটন*– এই পাঁচটি গ্রন্থের একটি করে সেট কলকাতা প্রেস ক্লাব সভাপতি স্নেহাশিস সুর, সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক এবং *দৈনিক আমার আসাম* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মনোজ কুমার গোস্বামীর হাতে তুলে দেন। কলকাতা প্রেসক্লাব সভাপতি ও সম্পাদক এসময় তাদের প্রেসক্লাব থেকে প্রকাশিত *অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববঙ্গের মহীয়সীরা* গ্রন্থটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এরপর কলকাতার সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ* সংকলন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন মন্ত্রী ও সচিব।

প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক বিপ্লব

দেশকে পেছনে নেওয়ার অপচেষ্টা রুখে দিতে ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ২৭শে ডিসেম্বর ২০২২ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র' সেমিনার ও বাচসাস সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা এবং আমাদের তরুণসমাজকে বিপথগামিতা, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই দেশে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব দরকার। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ জানাবো, আসুন সবাই মিলে সেটি করি। কারণ, যারা দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে চায়, 'টেক ব্যাক বাংলাদেশ' অর্থাৎ বাংলাদেশকে পেছনে নিয়ে যাও বলে স্লোগান দেয়, তাদের হাত থেকে দেশটাকে রক্ষা করা দরকার। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু সিনেমা ভালোবাসতেন বলেই তাঁর হাত ধরে সিনেমা শিল্প আমাদের দেশে চালু হয়েছে। গতবার আজীবন সম্মাননায় ভূষিত সোহেল রানা ভাই সিনেমা বানানোর পর বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে গেছেন এবং বঙ্গবন্ধু 'ভালোই তো করছ, অভিনয়েই থেকে যাও' বলায় বঙ্গবন্ধুর এক কথায় এই লাইনেই থেকে গেছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিনেমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন, এজন্য সিনেমাকে তিনি ভালোবাসেন। কারণ, ভালো সিনেমা সুষ্ঠু বিনোদনের জন্য সহায়ক। মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার হাত ধরে ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা শুরুর পর আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যে উচ্চতায় চলচ্চিত্র শিল্প ছিল, মাঝখানে সেটি থমকে গিয়েছিল। একে একে সিনেমা হলগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এবং ভালো সিনেমা, ভালো নির্মাতার অভাব সব মিলিয়ে থমকে গিয়েছিল। কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সিনেমা হলের সংখ্যা একশোর নীচে নেমে গিয়েছিল, সেটা আবার তিনশোতে পৌঁছেছে।

জাতীয় জীবনের মাইলফলক বিটিভির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রামের বাঁকে বাঁকে অবদান রাখা বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিটিভির ৫৯তম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ২৫শে ডিসেম্বর রাজধানীর রামপুরায় বিটিভি সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী । মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, বিটিভির মহাপরিচালক সোহরাব হোসেন ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন। বিটিভিকে নতুন আঙ্গিকে সাজানোর কথা উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, সংসদ বিটিভি ও বিটিভি চট্টগ্রাম নিয়ে এখন বিটিভির চারটি চ্যানেল। আরও ছয়টি বিভাগীয় শহরে বিটিভির পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ১৯৬৪ সাল থেকে বাংলা ভাষায় বিশ্বের

প্রথম টিভি চ্যানেল বিটিভি গত ৫৮ বছরের পথচলায় আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে লালন করার ক্ষেত্রে, আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে, দেশ ও জাতি গঠনে, জাতির মনন তৈরিতে যে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে সেটি অনস্বীকার্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এদেশে বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং সেই বেসরকারি টেলিভিশন যারা শুরু করেছিলেন তাদের বেশিরভাগেরই হাতেখড়ি বাংলাদেশ টেলিভিশনে। বিটিভি অনেক নামিদামি শিল্পীর জন্ম দিয়েছে। বিটিভির অনেক কর্মকর্তা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন এবং ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার পর বিটিভির চারজন কর্মকর্তাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে, স্মরণ করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় সব ক্ষেত্রেই বিটিভির অবদান রয়েছে। তৎকালীন ডিআইটি বর্তমান রাজউক ভবনে শুরুর পর রামপুরায় বিটিভির নতুন ভবন উদ্‌বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করতে না দেওয়ায় বিটিভির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেদিন কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সেই বিটিভির জন্য অনেক শুভকামনা।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২ তাঁর কার্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

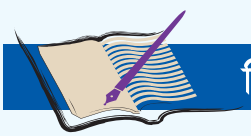

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সারা দেশে বই উৎসব পালিত

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বই বিতরণের মাধ্যমে এবছরও ১লা জানুয়ারি সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয় বই উৎসব। এর আগে ৩১শে ডিসেম্বর বিনামূল্যে নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিকের বই উৎসব উদ্‌বোধন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে। উদ্‌বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। এদিন গাজীপুরের কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বই উৎসবের উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। বিনামূল্যে বই বিতরণের এই উদ্যোগকে বিশ্বের মধ্যে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪ কোটি ৯ লাখ ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে সাড়ে ৩৪ কোটির বেশি কপি পাঠ্যবই ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী মিলিয়ে এই স্তরে ৯ কোটি ৯৮ লাখ ৫৩ হাজার এবং মাধ্যমিক স্তরে স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি মিলিয়ে ২৪ কোটি ৬৩ লাখ ১০ হাজার কপি পাঠ্যবই ছাপা হয়। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষার বই ছাপা হয় ২ লাখ ১২ হাজার ১৭৭ কপি।

একযুগ পর প্রাথমিকে আবারও বৃত্তি পরীক্ষা

সারা দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৩০শে ডিসেম্বর। ২০০৮ সালে সর্বশেষ এই পরীক্ষা হয়েছিল। পরের বছর ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা চালু হলে বাদ হয়ে যায় প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষা। সমাপনী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে দেওয়া হতো বৃত্তি। করোনার কারণে দুই বছর অনুষ্ঠিত হয়নি প্রাথমিকের সমাপনী পরীক্ষা।

সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের ওপর পরীক্ষার চাপ কমাতে নানা মহল থেকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করার দাবি উঠলেও ২৮শে নভেম্বর হুট করেই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আবারও এক যুগের আগের সেই বৃত্তি পরীক্ষা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বলা হয়, মোট শিক্ষার্থীর ১০ শতাংশ এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞান– এই চারটি বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষার্থীদের জানানো হয় এবারই হবে বৃত্তি পরীক্ষা। ফলে শিক্ষার্থীদের আলাদা দুটি পরীক্ষায় বসতে হবে।

শিশুদের হাতে নতুন শিক্ষাক্রমের বই

২০২৩ সাল থেকে নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাথমিকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি, মাধ্যমিকের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে শুরু হচ্ছে নতুন পাঠ্যক্রম। ১লা জানুয়ারি শিশুদের হাতে সরকার তুলে দেয় নতুন পাঠ্যক্রমের এই বই। নতুন এই শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা এবং দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, নতুন শিক্ষাক্রমের ভাবনা মাথায় রেখেই নতুন বইগুলো তৈরি করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা সব কিছু হাতেকলমে শিখতে পারবে। নতুন শিক্ষাক্রমের বই নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। শিক্ষকরা আগে যে পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রম পরিচালনা করতেন, শিক্ষার্থীরা তা আয়ত্ত করতে পারছে কি না, তা দেখা হতো না। ফলে শিক্ষার্থীরা সেগুলো না বুঝে মুখস্থ করেছে কিংবা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েছে বা কোচিং করেছে। পরে পরীক্ষার খাতায় লিখেছে। এখন

বিষয়টি ভিন্ন। বাংলা, ইংরেজি, গণিত থেকে সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস–এমনকি ধর্মশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে শিখবে। প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখবে। সেখানে শিক্ষকের ভূমিকা হবে গাইডের। পড়াশোনাটা আর চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হবে, খেলার মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। এভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনে সক্রিয় করা হবে শিক্ষার্থীদের। এছাড়া নতুন শিক্ষাক্রমে তৃতীয় শ্রেণি থেকে বাচ্চাদের কোডিং শেখানো হবে। খেলতে খেলতে তারা শিখবে। সুপার কিডস নামে একটা প্রোগ্রাম চালুর পরিকল্পনার কথা রয়েছে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী। এই প্রোগ্রামে ছয় থেকে ১৫ বছর বয়সি শিশুদের কোডিং ও এনিমেশন ডিজাইন শেখানো হবে। মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও বড়ো পরিবর্তন আনা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর ছয় মাস শেষে একটা পরীক্ষা আর বছর শেষে আরেকটা পরীক্ষা দিত। এখন প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসবে। এই বসায়ও পরিবর্তন আনা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

Dbqb : we‡kl cwZ‡e`b

বাংলাদেশ ডিডিটি মুক্ত

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ১৯৮৫ সালে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পাকিস্তান থেকে ৫০০ টন ডাইক্লোরো ডাফেনাইল ট্রাইক্লোরেথেন (ডিডিটি) আনা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই গবেষণায় বেরিয়ে আসে ডিডিটি বিপজ্জনক বিষাক্ত পাউডার। এই কীটনাশক মানুষের জন্য বিপজ্জনক ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও)। সেই ধারাবাহিকতায় সরকারিভাবে বাংলাদেশকে বিপজ্জনক জৈব রাসায়নিক কীটনাশক ডিডিটি মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ৮ই জানুয়ারি সচিবালয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন এ ঘোষণা দেন। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, সরকারিভাবে বাংলাদেশকে বিপজ্জনক জৈব রাসায়নিক পেস্টিসাইড ডিডিটি মুক্ত ঘোষণা করছি।

ডিডিটি দীর্ঘদিন ধরে মাটি ও পানিতে অপরিবর্তনীয় থাকে এবং খাদ্য, পানি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। এর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ক্যানসার ঝুঁকি, প্রজনন অক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় পরিবর্তন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমান সরকারের পদক্ষেপের ফলে দেশ এখন ডিডিটি মুক্ত।

পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে গণ্য

পাট এখন কৃষিপণ্য। ৯ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। ফলে ঋণপ্রাপ্তি ও পণ্য রপ্তানিতে কৃষিপণ্যের মতো সুযোগ-সুবিধা পাবে পাটপণ্য।

বর্তমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পাটজাত পণ্য ও পাটের আঁশের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। পাশাপাশি এখানে অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এটিকে কাজে লাগাতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে, এখন থেকে পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। এতদিন এটা কৃষিপণ্য ছিল না। অনেক দিন ধরেই পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে গণ্য করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সুপারিশ ও দাবি জানানো হচ্ছিল। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, এটাকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে গণ্য করা হবে। পাশাপাশি সে অনুযায়ী পাট খাত কৃষির সব সুযোগ-সুবিধা পাবে।

সামরিক শক্তি সূচকে বাংলাদেশের সুনাম

চলতি বছরের সামরিক শক্তি সূচকে বিশ্বের ১৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৪০তম অবস্থানে রয়েছে। সূচকে গত বছরের মতো এবারও শীর্ষ সামরিক ক্ষমতাধর দেশ নির্বাচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সামরিক সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে তৈরি করা আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (জিএফপি) এ সূচক প্রকাশ করেছে।

জিএফপি'র পর্যালোচনায় 'পাওয়ারস অন দ্য রাইজ' তালিকায় ১২তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। জিএফপি'র ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিরক্ষা পর্যালোচনায় 'পাওয়ারস অন দ্য রাইজ' হিসেবে ৫৩টি দেশকে বেছে নেওয়া হয়। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বিশ্বের ১৪৫টি দেশের সামরিক সক্ষমতার সর্বশেষ সহজলভ্য সামরিক সরঞ্জাম, প্রতিরক্ষা বাজেট, সৈন্য সংখ্যাসহ বিভিন্ন ধরনের ৬০টির বেশি মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে চলতি বছরের সূচক তৈরি করা হয়েছে। '২০২৩ মিলিটারি স্ট্রেন্থ র‍্যাংকিং' নামে প্রকাশিত এই সূচকে সামরিক শক্তিমত্তা বিচারে দেশগুলোর স্কোরও নির্ধারণ করা হয়েছে। সামরিক শক্তিসূচকে বাংলাদেশ শূন্য দশমিক ৫৮৭১ স্কোর পেয়ে ৪০তম হয়েছে। জিএফপি জানিয়েছে, গত ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতাকে এই সূচকের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে ২০০ মিটার লম্বা জাহাজ

দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথমবারের মতো ২০০ মিটার লম্বা জাহাজ ভিড়েছে। ১৬ই জানুয়ারি বন্দরের মূল জেটিতে ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজটি ভিড়ে। এর আগে সর্বোচ্চ ১৯০ মিটার লম্বা ও সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারত।

চট্টগ্রাম কনটেইনার টার্মিনালে (সিসিটি) ভিড়ানো বড়ো এই জাহাজের নাম 'কমন অ্যাটলাস'। জাহাজটি মার্শাল আইল্যান্ডের পতাকাবাহী। চট্টগ্রাম বন্দর সূত্র জানায়, জেটিতে বর্তমানে সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফট (পানির নীচে থাকা জাহাজের অংশ) এবং ১৯০ মিটার লম্বা জাহাজ ভিড়তে পারে। এমন প্রতিটি জাহাজ ২৫০০ থেকে ২৬০০ টিইইউএস কনটেইনার বহন করতে পারে। আর ১০ মিটার ড্রাফটের ২০০ মিটার লম্বা জাহাজ ৩৮০০ থেকে ৪০০০ কনটেইনার পরিবহণ করতে পারবে। অর্থাৎ এমন আকারের প্রতিটি জাহাজে বর্তমানের চেয়ে ১০০০ থেকে ১১০০ টিইইউএস কনটেইনার বেশি পরিবহণ করা যাবে। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারীরা কম খরচে পণ্য পরিবহণের সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। দেশের ভাবমূর্তি বাড়বে মেরিটাইম ওয়ার্ল্ডে।

১৯৭৫ সালে বন্দরে ১৬০ মিটার লম্বা ও সাড়ে ৭ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভেড়ানো হতো। ১৯৮০ সালে তা বাড়িয়ে ১৭০ মিটার লম্বা ও ৮ মিটার ড্রাফট করা হয়। ১৯৯০ সালে তা ১৮০ মিটার

লম্বা ও সাড়ে ৮ মিটার ড্রাফটে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৫ সালে ১৮৬ মিটার লম্বা ও ৯ দশমিক ২ মিটার ড্রাফট করা হয়। আর ২০১৪ সাল থেকে ১৯০ মিটার লম্বা ও সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়ানো শুরু হয়। এবার শুরু হলো আরও বড়ো জাহাজ ভিড়ানো।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

আইসিটি খাতে প্রতিবন্ধী কর্মী নিয়োগ

সরকার দেশের আইটি ও হাইটেক পার্কে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী কর্মী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ৭ই জানুয়ারি দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রতিবন্ধী চাকরি মেলার উদ্‌বোধনীতে একথা জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, আমাদের

প্রত্যেকটি হাইটেক পার্ক, সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পার্কে ও প্রত্যেকটি কোম্পানিকে অন্তত একজন করে হলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান বা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ সময় প্রতিবন্ধীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করতে নতুন প্রকল্প আসছে বলেও জানান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক শেখ মো. মনিরুজ্জামান বলেন, প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও তাদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে এ ধরনের এনজিওদের কাছে যে ফরেন ডোনেশন আসবে, সরকার তা দ্রুত ছাড় করার ব্যবস্থা করবে।

এছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের সুযোগ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথাও জানালেন সরকারের নীতিনির্ধারকরা। আগারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবন্ধী মেলায় স্টলগুলোর সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ডাটা এন্ট্রি, গ্রাফিক্স ডিজাইন, অ্যানিমেশন, ওয়েব ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, কল সেন্টার এজেন্টসহ বিভিন্ন পদের জন্য জীবনবৃত্তান্ত জমা দেন প্রতিবন্ধীরা। এছাড়া অনলাইনে সারা দেশ থেকে আবেদন পড়েছে আরও পাঁচ শতাধিক।

এবারের মেলায় তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ৫৪টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। উদ্যোক্তারা জানান, যাচাই-বাচাই শেষে কাজের সুযোগ যোগ্যরাই পাবেন। ২০১৫ সাল থেকে চাকরি মেলার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৮২টি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পেয়েছেন ৮৭৯ জন প্রতিবন্ধী।

'মনের বন্ধু' অ্যাপ

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে 'মনের বন্ধু' অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এ অ্যাপটি দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের উপকারে আসবে। ১০ই জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি অডিটোরিয়ামে অ্যাপটির উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মন যা চায়, তাই করতে হবে। মনের কথা শুনতে হবে। 'মনের বন্ধু' শব্দের মধ্যে একটা আবেগ আছে। মানসিক স্বাস্থ্যে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। পাশাপাশি আমাদের চিন্তা-চেতনাকে উন্নত করতে হবে, যা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, মানসিক অসুস্থতা মানেই পাগল নয়। শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। 'মনের বন্ধু' অ্যাপ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। আশা করি, তা মানুষের মন ভালো রাখতে সাহায্য করবে।

মনোচিকিৎসক ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. আহমেদ হেলাল বলেন, মন ভালো না থাকলে শরীর ভালো থাকে না। তাই শুধুমাত্র শারীরিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিলে আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারব না। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করতে গুগল প্লেস্টোরে যেতে হবে। সেখান থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করলেই মনের বন্ধু অ্যাপ থেকে সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যাবে। অ্যাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে ওয়েবসাইটে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

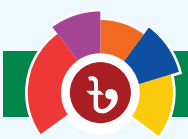

A_bxZ : we‡kl cwZ‡e`b

দেশের রপ্তানি আয়ে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও আশার আলো দেখাচ্ছে দেশের রপ্তানি আয়ে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি। এতে ডলারের সংকটও কেটে যাবে বলে আশা রপ্তানিকারকদের। এছাড়া তিন কারণে এই রেকর্ড আয় হয়েছে বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা। নতুন বাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যের পোশাকের চাহিদা এবং বিশ্ববাজারে ইতিবাচক ভাবমূর্তি এই আয়ের মূল কারণ।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে বড়ো দুই উৎস রপ্তানি বাণিজ্য ও রেমিট্যান্স। বিদায়ী বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে রেমিট্যান্সে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এবার সুখবর এল রপ্তানি থেকেও।

২রা জানুয়ারি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্যে দেখা গেছে, ২০২২ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরে রেকর্ড ৫৩৬ কোটি ৫১ লাখ ৯০ হাজার ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা এক মাসের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বরেও ৪৯০ কোটি ৭৬ লাখ ৮০ হাজার ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। এ বছর নভেম্বরে প্রথমবারের মতো এক মাসের

রপ্তানি আয় ৫০০ কোটির ঘর ছাড়ায়। এই হিসাবে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় আগের বছরের একই মাসের চেয়ে ৯.৩৩ শতাংশ বেড়েছে।

ইপিবির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট দুই হাজার ৭৩১ কোটি ১২ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৫৮ শতাংশ বেশি।

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে গোয়ালগাদ্দা শিম

সিলেটে শীতের সবজির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে স্থানীয় জাতের 'গোয়ালগাদ্দা' শিমের। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এখন এ শিম যাচ্ছে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। শিম রপ্তানি করে আয় হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা। এছাড়া কৃষকরাও হচ্ছেন উপকৃত। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গোয়ালগাদ্দা শিম চাষ নিয়ে কৃষকদের মাঝেও আগ্রহ বাড়ছে।

শীতকালে সিলেটের প্রায় সবকটি উপজেলায় গোয়ালগাদ্দা শিমের চাষ হয়। বিশেষ করে গোলাপগঞ্জ ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় এ জাতের শিমের চাষাবাদ হয়ে থাকে বেশি। গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মণাবন্দ, লক্ষ্মীপাশা ও ফুলবাড়ি ইউনিয়নে এ জাতের শিম বেশি উৎপাদন হয়ে থাকে। এক সময় এ শিমের চাহিদা সিলেটের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য জাতের শিমের চেয়ে গোয়ালগাদ্দা বেশি সুস্বাদু হওয়ায় এর সুনাম ধীরে ধীরে দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশে সিলেটী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে গোয়ালগাদ্দা শিমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় রপ্তানিকারকরা তাদের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যুক্ত করেন এ শিম। কয়েক বছর ধরে গোয়ালগাদ্দা শিম ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্তত ১৩টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় শেখ হাসিনা

বিশ্বখ্যাত মার্কিন সাময়িকী *ফোর্বস*-এর প্রকাশিত বিশ্বের ১০০ জন ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি প্রকাশিত এ তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান ৪২তম। রাজনীতি ও নীতি শ্রেণিতে স্থান পাওয়া ২২ জনের মধ্যে শেখ হাসিনা রয়েছেন ১১তম স্থানে।

এবারের প্রকাশিত তালিকায় বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লগার্দ আর তৃতীয় স্থান যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে *ফোর্বস* লিখেছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময়ের প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে তিনি চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। *ফোর্বস* আরও বলছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের নাগরিকদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলোতে জোর দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। শেখ হাসিনার চলমান সংগ্রাম বাংলাদেশে একটি দৃঢ় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে। উল্লেখ্য, আগের বছর এই তালিকায় ৪৩তম অবস্থানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

j¨vb‡m‡Ui ১০ বিজ্ঞানীর তালিকায় সেঁজুতি সাহা

বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞান সাময়িকী *ল্যানসেট*-এর প্রকাশিত সেরা ১০টি বিজ্ঞানীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের অনুজীব বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা। সম্প্রতি ল্যানসেট ১০ বিজ্ঞানীর পরিচিতি প্রকাশ করে এ তালিকা প্রকাশ করেছে।

ল্যানসেট সেঁজুতি সম্পর্কে বলেছে, তিনি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গবেষণা নিয়ে সমতার পক্ষে এক জোরদার কণ্ঠ। সেঁজুতি এবং সিএইচআরএফে তাঁর দল মিলে জীবাণুর জিন নকশা উন্মোচন কিংবা ভাইরাসের গবেষণায় রত থাকেন। বাংলাদেশের শিশুদের আক্রান্ত করে, এমন কিছু রোগ, যেমন– ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া নিয়ে তাদের গবেষণা অব্যাহত আছে। *ল্যানসেট* আরও বলছে, সতীর্থ বিজ্ঞানী, বিশেষ করে নারী বিজ্ঞানীদের জন্য সবসময় তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। শিশুদের বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর চেষ্টা নিরন্তর।

সেঁজুতি সাহা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (সিএইচআরএফ) পরিচালক। ২০২০ সালের মার্চে প্রথম দেশে করোনাভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয়। সেঁজুতি সাহার নেতৃত্বে দেশে প্রথম করোনাভাইরাসের জিন নকশা উন্মোচিত হয়।

ভারতে যুদ্ধবিমানের প্রথম মুসলিম নারী পাইলট

ভারতে প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিমানের চালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সানিয়া মির্জা নামের এক মুসলিম নারী পাইলট। ২৪শে ডিসেম্বর *প্রথম আলো* পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ভারতের সংবাদমাধ্যম *এএনআই* বলছে, ভারতের প্রথম মুসলিম নারী ফাইটার পাইলট হওয়ার পাশাপাশি দেশটির

উত্তর প্রদেশের তিনিই প্রথম ভারতীয় বিমানবাহিনীর ফাইটার পাইলট হতে যাচ্ছেন। সানিয়া উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তর প্রদেশ বোর্ডে ১২তম হন। আর সেঞ্চুরিয়ান ডিফেন্স একাডেমিতে এনডিএ পরীক্ষায় ১৪৯তম হন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশেষ বয়স্ক ভাতা চালু

দেশের বয়স্ক মানুষের জন্য বিশেষ বয়স্ক ভাতা চালু করছে সরকার। ৯০ বছরের বেশি বয়সিদের এ ভাতা দেওয়া হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে নীতিমালা তৈরিসহ একটি প্রস্তাব তৈরির কাজ করছে। অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে চলতি অর্থবছর থেকেই এই বিশেষ বয়স্ক ভাতা চালু করা যাবে। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে প্রতি জনকে।

দেশের মোট ৪৯ লাখ মানুষ বয়স্ক ভাতা পেয়ে থাকে। এর মধ্যে ২ লাখ মানুষের বয়স ৯০ বছরের বেশি। ৯০ বছরের বেশি বয়সিদের বিশেষ বয়স্ক ভাতা চালু হলে, তারা বয়স্ক ভাতা থেকে আলাদা হয়ে যাবেন। দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য কমানো এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সরকার। প্রতিবছরই ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বাড়ছে। সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মোট ১২৬টি কার্যক্রম ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়ন করছে সরকার।

প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে সরকারের বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় ৪৯ লাখ দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ৮০ বা এর বেশি বয়সিরা বেশি অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে রয়েছেন। সরকার এর মধ্যে ৯০ বছরের বেশি বয়সিদের বিশেষ নজরের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বয়স্ক ভাতা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।

পাশাপাশি সরকার দেশের সাধারণ জনগণের জন্য একটি পেনশন স্কিম চালু করতে যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ থেকে ৫০ বছরের সাধারণ নাগরিক এই সুবিধার আওতায় আসবেন। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এ বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন) বলেন, ৯০ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষের জন্য বিশেষ বয়স্ক ভাতা দিতে আমরা একটি নীতিমালা করছি। নীতিমালা অনুযায়ী এই ভাতাটা দেওয়া হবে। আমাদের প্রস্তুতি শেষ হলে আমরা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানাব।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরে ৪ লাখ ৪ হাজার ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হয়। তখন প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হতো। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ভাতা বেড়ে হয় ৩০০ টাকা। ওই বছর ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় সাড়ে ২২ লাখ। এরপর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ভাতা বেড়ে হয় ৫০০ টাকা। এই অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা হয় ৪০ লাখ। পরের বছর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪৪ লাখ মানুষকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হয়। এক কোটিরও অধিক ভাতাভোগী ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা পাচ্ছেন।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, এক কোটিরও অধিক ভাতাভোগী ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা পাচ্ছেন। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসে ভাতা পাওয়ায় ভোগান্তি দূর হয়েছে। ২১শে ডিসেম্বর ২০২২ মন্ত্রী রাজধানীর আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরে 'ক্যাশ ট্রান্সফার মর্ডানাইজেশন (সিটিএম)' প্রকল্প হতে সমাজসেবা কর্মকর্তাদের মোটরসাইকেল বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। এসময় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু ও মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম।

মন্ত্রী বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণে বিভিন্ন অনিয়ম ও দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ ছিল। ভাতা বিতরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ডিজিটাল হওয়ায় সেসব অভিযোগ দূর হয়েছে। ক্যাশ ট্রান্সফার মর্ডানাইজেশন প্রকল্পের মাধ্যমে এক কোটিরও অধিক ভাতাভোগীর ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতাসহ বিভিন্ন ধরনের ভাতার হার ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এর আগে মন্ত্রী সমাজসেবা কর্মকর্তাদের হাতে মোটরসাইকেলের চাবি হস্তান্তর করেন। তৃণমূল পর্যায়ে ৫৭০ জন সমাজসেবা কর্মকর্তাদের মাঝে মোটরসাইকেল বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

বোরোর আবাদ ও উৎপাদন বাড়াতে ১৭০ কোটি টাকার প্রণোদনা

বোরোর আবাদ ও উৎপাদন বাড়াতে প্রায় ১৭০ কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। সারা দেশের ২৭ লাখ কৃষক এ প্রণোদনার আওতায় বিনামূল্যে বীজ ও সার পাচ্ছেন। ২০শে ডিসেম্বর কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। তিনটি ধাপে বা ক্যাটাগরিতে এসব প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। হাইব্রিড ধানের উৎপাদন বাড়াতে প্রায় ৮২ কোটি টাকার প্রণোদনার আওতায় ১৫ লাখ কৃষকের প্রত্যেককে দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে ২ কেজি ধান বীজ।

উচ্চফলনশীল জাতের উৎপাদন বাড়াতে প্রায় ৭৩ কোটি টাকার প্রণোদনার আওতায় উপকারভোগী কৃষক ১২ লাখ। এতে একজন কৃষক এক বিঘা জমিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে পাচ্ছেন।

এছাড়া কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুবিধার্থে একটি মাঠে একই সময়ে ধান লাগানো ও কাটার জন্য ১৫ কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। এর আওতায় ৬১টি জেলায় ১১০টি ব্লক বা প্রদর্শনী স্থাপিত হবে। প্রতিটি প্রদর্শনী হবে ৫০ একর জমিতে, খরচ হবে ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত থেকে এ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে এসব প্রণোদনা

বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। এরই মধ্যে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ প্রণোদনা বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার বাড়াতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণাও গুরুত্ব দিয়ে চালিয়ে যেতে হবে। ১৯শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গবেষণাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যারা এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে বাইরে যান, তাদের আমরা অর্থ সহায়তা দিই। মন্ত্রণালয় থেকেও গবেষণার জন্য সহায়তা দেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, কৃষি আগে ছিল আমাদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন। এখন কিন্তু কৃষি সেখানে সীমাবদ্ধ

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২৭শে ডিসেম্বর ঢাকায় কেআইবি অডিটোরিয়ামে বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

নেই। কৃষি এখন অর্থকরী ফসল। কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়, সেই রপ্তানি বাড়াতে ও কৃষির বাণিজ্যিক ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে।

কৃষিবিদদের স্মার্ট কৃষি গড়ে তোলার আহ্বান

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট কৃষি গড়ে তোলার জন্য কৃষিবিদদের আহ্বান জানান কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। ২৭শে ডিসেম্বর রাজধানীর খামারবাড়িতে কেআইবি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনাসভায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশে সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব ঘটেছে কৃষিতে। স্বাধীনতার পর যেখানে এক কোটি ১০ লক্ষ টন চাল উৎপাদন হতো, সেখানে এখন তা চার কোটি চার লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। গম, ভুট্টা, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনেও এসেছে ব্যাপক সাফল্য। এই সাফল্যের নায়ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর তার কারিগর হলেন দেশের কৃষিবিদ ও কৃষক।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ জলবায়ু অভিযোজন কেন্দ্রে পরিণত

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সংস্থান থেকে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) বাস্তবায়নে ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। ২০২৩-২০৫০ সালের জন্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতির পরিবর্তনশীল গতিপথের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে একটি জলবায়ু অভিযোজন কেন্দ্রে পরিণত করেছে। ১১ই ডিসেম্বর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত 'গ্লোবাল হাব অন লোকালি লেড অ্যাডাপটেশন' খোলার ঘোষণায় এসব কথা বলেন তিনি।

গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে শেখ হাসিনা আরও বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন থেকে অভিযোজনে ব্যয় করে এবং সম্প্রতি ২০২৩-২০৫০ সালের জন্য এনএপি (ন্যাপ) চালু করেছে। কপ ১৫-এর পর বাংলাদেশ তার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই তহবিলটি জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন উভয় ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ৮০০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। একইসঙ্গে প্রধান কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলোকে তাদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানের সুযোগ আরও বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানাই। তিনি বলেন, আমাদের সবাইকে অবশ্যই বৈশ্বিক উষ্ণতা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে বসবাস করে আসছে এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যসব বিপদের বিরুদ্ধে এক ধরনের স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করেছে। তারা প্রকৃতির পরিবর্তনশীল গতিপথের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে একটি জলবায়ু অভিযোজন কেন্দ্রে পরিণত করেছে। তিনি আরও বলেন, সরকার সম্পদ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমাধানগুলো সমর্থন করে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

thvMvfhvM I wbivc` moK : we‡kl cwZ‡e`b

১০০টি রাস্তা-মহাসড়ক উদ্‌বোধন

১০০টি সেতু উদ্‌বোধনের দেড় মাস পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ডিসেম্বর ২০২২ তাঁর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশের ৫০টি জেলায় ২০২১ দশমিক ৫৬ কিলোমিটার সম্মিলিত দৈর্ঘ্যের ১০০টি সড়ক ও মহাসড়ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাঁর কার্যালয়ে ২১শে ডিসেম্বর ২০২২ দেশের ৫০ জেলায় উন্নয়নকৃত ১০০টি মহাসড়ক উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দেন সড়ক, পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের– পিআইডি

উদ্‌বোধন করেন। সম্প্রতি আটটি বিভাগে অধিকাংশ রাস্তা নির্মাণ বা উন্নয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী এর আগে গত ৭ই নভেম্বর সারা দেশের ২৫টি জেলায় ১০০টি সেতুর উদ্‌বোধন করেন।

১০০টি মহাসড়কের মধ্যে ৯৯টি সরকারি তহবিল থেকে সম্পন্ন হয়েছে, বাকি একটি এবং ৭০ কিলোমিটার গাজীপুরের জয়দেবপুর থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা মহাসড়ক পর্যন্ত ৬১৬৮ দশমিক ৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চার লেনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এডিবি, ওপেক ও আবুধাবির তহবিলের আওতায়। এ প্রকল্পের আওতায় দুই পাশে সার্ভিস লেন দিয়ে সড়কটি চার লেন করা হয়েছে। সড়ক ও মহাসড়কের একটি ২২,৭৭৪ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সড়ক, পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। এ সময় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যসচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সড়ক, পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরী সড়কের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন।

সড়ক পরিবহণ বিধিমালা ২০২২

সড়ক দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে এককালীন অন্তত ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান রেখে সরকার জারি করেছে 'সড়ক পরিবহণ বিধিমালা ২০২২'। সড়ক পরিবহণ আইন হওয়ার চার বছরেরও বেশি সময় পর বিধিমালাটি জারি হলো। এ বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ২৭শে ডিসেম্বর ২০২২।

বিধিমালায় বলা হয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে এককালীন অন্যূন ৫ লাখ টাকা; দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি হলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে অন্যূন ৩ লাখ টাকা। এছাড়া গুরুতর আহত বা চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে ৩ লাখ টাকা। চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ হবে অন্যূন এক লাখ টাকা। সরকারের অনুমোদনে ট্রাস্টি বোর্ড আর্থিক সহায়তার পরিমাণ কমাতে ও বাড়াতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয় বিধিতে। আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্যে দুর্ঘটনা ঘটার সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারকে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি একটি ট্রাস্টি বোর্ড নিষ্পত্তি করবে।

২০ বছরের কম বয়সিরা বাস, মিনিবাস কিংবা লেগুনার কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজার হতে পারবে না– এমন নিয়ম রেখে 'সড়ক পরিবহণ বিধিমালা ২০২২' জারি করেছে সড়ক, পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ। কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা পঞ্চম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সুপারভাইজারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। গণপরিবহণে চালক, কন্ডাক্টর বা সুপারভাইজার নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডোপ টেস্ট সনদ থাকতে হবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

Pj"Pî I ms¯‹…wZ: we‡kl cÖwZ‡e`b

ভারতের প্রেক্ষাগৃহে nvIqv

বাংলাদেশের ব্যাবসা সফল ছবি এবার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে মুক্তি পেল ভারতে। সারা ভারতে ৬ই জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশের আলোচিত ছবি *হাওয়া*। মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত ছবিটি একই সাথে ভারতের পাঁচটি রাজ্যে চলছে– এমন খবরই জানিয়েছে ভারতের প্রযোজনা সংস্থা রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট। তাদের ব্যানারেই সারা ভারতে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছে রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট ও *হাওয়া* ছবির অফিসিয়াল পেজ। ইংরেজি সাবটাইটেল সহযোগে সেখানকার দর্শক ছবিটি দেখতে পারছে।

এর আগে ১৬ই ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যের ৩৪টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় *হাওয়া*। ৩০শে

ডিসেম্বর সারা ভারতে ছবিটি মুক্তির ঘোষণা দিয়েছিল রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট। অবশেষে ৬ই জানুয়ারি দিল্লি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশে মুক্তি পায় *হাওয়া*। এ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন– চঞ্চল চৌধুরী, নাজিফা তুষি, শরীফুল রাজ, সুমন আনোয়ার, নাসির উদ্দিন খান, সোহেল মণ্ডল, রিজভী রিজুসহ আরও অনেকে।

ঢাকা লিট ফেস্ট ২০২৩

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অনুষ্ঠিত হয় দেশি-বিদেশি কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও লেখকদের মিলনমেলা 'ঢাকা লিট ফেস্ট ২০২৩'। এবার ছিল ঢাকা লিট ফেস্টের দশম আয়োজন। ৫ই জানুয়ারি বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে মণিপুরী, ক্লাসিক্যাল, রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় এবারের উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান।

ঢাকা লিট ফেস্ট ২০২৩-এর উদ্‌বোধন করেন নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক আবদুলরাজাক গুরনাহ, ভারতীয় লেখক ও সাহিত্য সমালোচক অমিতাভ ঘোষ, বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা। ফেস্টে অন্যতম আলোচক ছিলেন সোমালিয়ান সাহিত্যিক নুরুদ্দিন ফারাহ। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী এই বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্ব, অনুষ্ঠানে নোবেল বিজয়ী ভারতীয় সাহিত্যিক আবদুলরাজাক গুরনাহ, এবং অমিতাভ ঘোষ এবং অন্যান্য অতিথিরা তাদের বক্তৃতায় বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। চার দিনের এই আয়োজনে ছিল কথোপকথনের একটি বৈচিত্র্যময় মিশ্রণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সেশন, শিশু ও তরুণদের জন্য আকর্ষণীয় আয়োজন, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাট্য, সংগীত এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এবারের আয়োজন সাজানো হয়েছিল একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে। বিশ্ব সাহিত্যের সাথে বাংলা সাহিত্যের সেতুবন্ধের মধ্য দিয়ে ৮ই জানুয়ারি বাংলা একাডেমিতে শেষ হয় চারদিনের ঢাকা আন্তর্জাতিক লিট ফেস্ট। সেশনে অংশ নেন শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার পাঁচ মহাদেশের পাঁচ শতাধিক বক্তা। সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই ঢাকা লিট ফেস্টের আয়োজক প্রতিষ্ঠান যাত্রিকের প্রযোজনায় নায়লা আজাদের নারী অধিকার, সমতা, সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে প্রদর্শিত হয় নৃত্য।

প্রতিবেদনঃ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

এএইচএফ অনূর্ধ্ব-২১ কাপ হকি
ওমানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

ওমানকে হারিয়ে এশিয়ান হকি ফেডারেশন (এএইচএফ) কাপ অনূর্ধ্ব-২১ হকি টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ১২ই জানুয়ারি ওমানের মাসকাটে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে বাংলাদেশ শুটআউটে ৭-৬ গোলে হারিয়েছে ওমানকে। এর আগে ২০১৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে এই ওমানকে ৪-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। তাছাড়া উক্ত টুর্নামেন্টের আগে এক ম্যাচে শ্রীলঙ্কানদের জালে একে একে ১৪টি গোল করেছে লাল-সবুজের দল। তবে একটি গোলও শোধ করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা দল।

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সুপার সিক্সে বাংলাদেশের মেয়েরা

অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের মেয়েদের জয়যাত্রা চলছেই। ১৬ই জানুয়ারি বেনোনির উইলিমুর বি পার্কে শ্রীলঙ্কাকে ১০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তাতে সুপার সিক্স অনেকটা নিশ্চিত করল বাংলাদেশের মেয়েরা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকায় বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে আয়োজিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)-এর জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন– পিআইডি

প্রতি গ্রুপের সেরা তিন দল খেলবে সুপার সিক্সে। সেখানে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বাংলাদেশ এরই মধ্যে পেল ৪ পয়েন্ট। এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক ভিশ্মি গুনারত্নে। দুই ব্যাটারের ফিফটিতে ২০ ওভারে ২ উইকেটে ১৬৫ রান করে বাংলাদেশ। উইলিমুর পার্ক বিতে ১৬৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪ উইকেট হারিয়ে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ ১৫৫ রান। ফলে ১০ রানের সহজ জয় পায় বাংলাদেশ।

এর আগে ১৪ই জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার বেনোনিতে আসরের উদ্‌বোধনী ম্যাচে আগে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেটে ১৩০ রানের সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়া। সেই লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১২ বল এবং ৭ উইকেট হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশের মেয়েরা।

প্রতিবেদনঃ মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন বীর উত্তম শামসুল আলম

আফরোজা রুমা

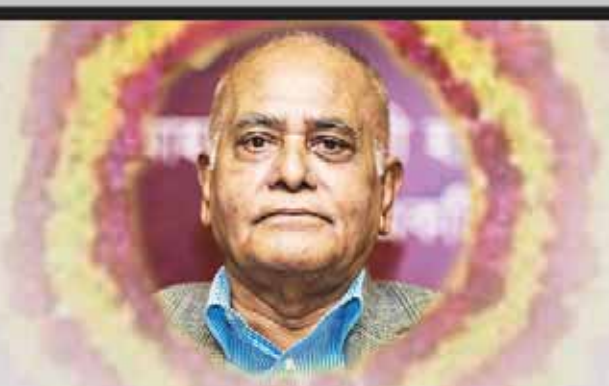

স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন শামসুল আলম না ফেরার দেশে চলে গেলেন। ৮ই ডিসেম্বর ঢাকার একটি হাসপাতালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

১৯৪৭ সালে শামসুল আলমের জন্ম পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার পাতিলাপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার ও মায়ের নাম শামসুন নাহার বেগম।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন। এরপর তিনি যুদ্ধবিমান, বোমারুবিমান ও পরিবহণ বিমান চালানোয় বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর, ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের চাকলালা বিমান ঘাঁটিতে নজরবন্দি অবস্থায় অবস্থান করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং তেজগাঁও বিমানবন্দরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তাঁর ওপর চলে নির্মম নির্যাতন। আগস্ট মাসে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন ক্যাম্প থেকে তিনি পালাতে সক্ষম হন এবং ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। সেখানে শামসুল আলমসহ সাতজনকে নিয়ে গঠন করা হয় মুক্তিযুদ্ধরত বাংলাদেশের প্রথম বিমানবাহিনী যার সাংকেতিক নাম ছিল 'কিলো ফ্লাইট'। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর নেতৃত্বে একক ইঞ্জিনবিশিষ্ট একটি অটার বিমান চট্টগ্রামে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে সফল অভিযান পরিচালনা করে। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে স্বাধীন বাংলাদেশের বিমানবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শামসুল আলম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ সময় তাঁকে জাতির পিতার চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট একটি 'এএন ২৪' ভিআইপি বিমানের পাইলট নিযুক্ত করা হয়।

১৯৮৪ সালের নভেম্বরে স্বেচ্ছায় অবসরের পূর্বে শামসুল আলম বিমানবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। অবসরের পর তিনি ট্রেডিং ব্যাবসা শুরু করেন। এ ব্যাবসায়ে তিনি ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেন। নিজের ব্যাবসার পাশাপাশি তিনি একজন স্পন্সর ডিরেক্টর হিসেবে কনফিডেন্স গ্রুপে যোগদান করেন। এক পর্যায়ে তিনি কনফিডেন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান পদে গুরুদায়িত্বও পালন করেন। বই পড়া, লেখা এবং গান শোনা ছিল তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস। স্কুল, মসজিদসহ অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। দুইবার তিনি ফ্লাইং ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখায় ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি জীবিত যোদ্ধাদের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'বীর উত্তম' লাভ করেন।

৯ই ডিসেম্বর বাদ জুম্মা গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদে (আজাদ মসজিদ) তাঁর জানাজা হয়। পরে বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

mwPÎ evsjv‡`k পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা পাঠাতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 07, January 2023, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
Z_¨ I m¤úPvi gšYvjq
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd